শব্দ

শ্রীজগদানন্দ রায় প্রণীত

প্রকাশক

ইণ্ডিয়ান্ প্রেস্ লিমিটেড্, এলাহাবাদ

১৩৩১

[মূল্য এক টাকা

প্রকাশক
শ্রীকালীকিঙ্কর মিত্র
ইণ্ডিয়ান্ প্রেস্ লিমিটেড,
এলাহাবাদ

প্রাপ্তিস্থান
১। ইণ্ডিয়ান্ পাব্‌লিশিং হাউস্
২২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২। ইণ্ডিয়ান্ প্রেস্ লিমিটেড, এলাহাবাদ

কান্তিক প্রেস
২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

পরম কল্যাণ-ভাজন

ধীমান্ শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

শ্রীকর-কমলে

নিবেদন

"শব্দ" প্রকাশিত হইল। ইহাতে শব্দ-বিজ্ঞানের মোটামুটি তত্ত্বগুলি যথাসম্ভব সহজ ভাষায় লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি। পাঠক-সাধারণ, বিশেষতঃ আমাদের ছেলেমেয়েরা ইহা পড়িয়া আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করিলে ধন্য হইব।

শব্দ-তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য যে-সকল মূল্যবান্ যন্ত্রপাতির ব্যবহার আছে, পুস্তকে সেগুলির উল্লেখ নাই। কারণ সাধারণ পাঠক সেগুলিকে নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিবার সুবিধা পাইবেন না। তাই যে-সকল প্রাকৃতিক ঘটনায় শব্দ-বিজ্ঞানের মূল-তত্ত্ব বুঝিবার সুযোগ আছে, পুস্তকে সেইগুলিরই উল্লেখ করিয়া বিষয়গুলিকে সুব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। ইহাতে কত দূর কৃতকার্য্য হইলাম, সুধী পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন।

পুস্তকের প্রচ্ছদ-পট বিশ্বভারতীর ছাত্র শ্রীমান্ মণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের অঙ্কিত। ইহা ছাড়া বিশ্বভারতীর কলা-বিভাগের ছাত্রগণ আরো কয়েকখানা চিত্র আঁকিয়া দিয়াছেন। এই সুযোগে শিল্পী ও প্রকাশক মহাশয়দিগের নিকটে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

শান্তিনিকেতন
আশ্বিন, ১৩৩১

শ্রীজগদানন্দ

সূচী

শব্দ

প্রথম কথা

বাগানের কাক-কোকিলের ডাকে আমাদের ভোরে ঘুম ভাঙিয়া যায়। তখনো রাত্রির অন্ধকার থাকে। পাখীরা বোধ করি বাসায় শুইয়া "ভোর হল, ভোর হল, বলিয়া জানাইয়া দেয়, রাত্রি আর নাই। তার পরে যত বেলা হয়, ততই কত রকম শব্দ যে আমাদের কানে আসে, তা' বলিয়াই শেষ করা যায় না। গোয়াল-ঘরে গরু-বাছুরের হাম্বা রব, রাস্তায় গাড়ির গড়গড়ানি, ফেরিওয়ালার "আম চাই, চুড়ি চাই" চীৎকার, বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের হাসির গররা, এই রকম নানা শব্দে যেন আকাশ ভরিয়া উঠে। স্কুলে গেলেও মাষ্টার মহাশয়ের কণ্ঠরব, আর ছেলেদের গুঞ্জন-ধ্বনি। সেখানেও শব্দ। তার পরে সেই ছুটির ঘণ্টা। দেখ, ঘরে বাহিরে কত শব্দ। আবার

শব্দই বা কত রকম বে-রকম! কোনো শব্দ কর্কশ, শুনিতে একটুও ভালো লাগে না; কোনটি মধুর, ইচ্ছা করে আরো শুনি। কোনো শব্দের অর্থ আছে, কোনটার অর্থ বুঝা যায় না।

যাহা হউক এই পৃথিবীতে শব্দ আছে বলিয়াই যেন আরাম পাওয়া যায়। শব্দ না থাকিলে এই পৃথিবী কি ভয়ানকই হইত একবার ভাবিয়া দেখ। তিন প্রহর রাত্রিতে যখন চারিদিক্ নিঝুম, তখন হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গেলে কি রকম মনে হয়, তোমরা দেখ নাই কি? শব্দ নাই, আলো নাই,—ইহাতে প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠে। শব্দ পৃথিবীর আনন্দ।

কি রকমে শব্দ উৎপন্ন হয়, কি রকমে তাহা আমাদের কানে পৌঁছায়। কোনো শব্দ শুনিতে ভালো এবং কোনো শব্দ শুনিতে মন্দ লাগে কেন। এই সব কথা জানিতে তোমাদের ইচ্ছা হয় না কি? আমরা শব্দ-সম্বন্ধে সেই রকম অনেক কথা তোমাদিগকে বলিব।

শব্দের ঢেউ

প্রথমেই দেখ, কান না থাকিলে আমরা শব্দ শুনিতে পাইতাম না। আঙুল দিয়া খুব জোরে কান বন্ধ কর, একটুও শব্দ শুনিতে পাইবে না। কেন জানি না, ছেলেবেলায় মেঘের ডাকে বড় ভয় হইত। তাই বিদ্যুৎ চম্‌কাতেই কানে আঙুল দিতাম। তখন মেঘের ডাক এবং বৃষ্টির শব্দ একটুও শুনিতে পাইতাম না। বড় মজা হইত!

আমাদের শরীরে যত যন্ত্র আছে, তাহার সকলগুলিই দরকারি। ইহাদের একটা বিকল হইলে অসুখ করে। কিন্তু সব চেয়ে দরকারি যন্ত্র আমাদের মস্তিষ্ক। দেখা-শুনা ভাবনা-চিন্তা সকলি মস্তিষ্কেই করায়। মস্তিষ্ক থাকে, আমাদের মাথার হাড়ের ভিতরে অতি যত্নে। তাহাতে কোন রকমে বেশী আঘাত লাগিলে আমাদের মাথা ঘোরে এবং আমরা অজ্ঞান হইয়া যাই। যাহা হউক, এই মস্তিষ্কই শব্দ-জ্ঞান, অর্থাৎ শব্দ শুনার মূলাধার। তা' ছাড়া খুব সরু সূতার মত স্নায়ু আমাদের সর্ব্বাঙ্গে আছে, তাহাও শব্দ শুনার কাজে সাহায্য করে। এই স্নায়ু আমাদের শরীরকে যেন জালের মত ছাইয়া আছে। শরীরের কোনো জায়গায় কোনো রকম আঘাত বা উত্তেজনা লাগিলে টেলিগ্রাফের তারের মতো ঐ স্নায়ুই সেই সকল

উত্তেজনাকে বহিয়া মস্তিষ্কে লইয়া যায়। ইহাতে আমরা বাহিরের আঘাত-উত্তেজনা বুঝিতে পারি।

মনে কর, তোমার আঙুল ছুরিতে কাটিয়া গেল, তুমি বেদনা বোধ করিলে। স্নায়ুই এই কাটার উত্তেজনা বহিয়া লইয়া যায় এবং ইহাতেই তুমি বেদনা বুঝিতে পার। কোনো রকমে যদি স্নায়ু বিকল হইয়া যায়, তাহা হইলে শরীরের একটা অঙ্গ কাটিয়া ফেলিলেও তাহার বেদনা বোধ করা যায় না।

টেলিগ্রাফের একই তারে যুদ্ধের খবর, ডাকাতির খবর, জাহাজ-ডুবির খবর এবং আরো কত কি খবর আনাগোনা করে। কিন্তু যে-স্নায়ু টেলিগ্রাফের তারের মতো আমাদের দেহের খবর মস্তিষ্কে লইয়া যায়, তাহার একটাতে সব রকম উত্তেজনার খবর মস্তিষ্কে যায় না। যে-স্নায়ু আলোর উত্তেজনা বহিয়া দেহের কাজ চালায়, গন্ধের উত্তেজনা বহিয়া সেগুলি গন্ধ শোঁকাইতে পারে না। আবার খাবার মুখে ফেলিলে যে-স্নায়ু উত্তেজিত হইয়া ভালো-মন্দ স্বাদের খবর মস্তিষ্কে লইয়া যায়, সেগুলি শব্দের উত্তেজনা বহিতে পারে না। তাহা হইলে দেখ, রকম রকম উত্তেজনা বহিবার জন্য রকম রকম স্নায়ু আমাদের শরীরে আছে। কেবল ইহাই নয়, রকম রকম উত্তেজনা বুঝিবার জন্য আমাদের মস্তিষ্কে আবার ভিন্ন ভিন্ন কুঠারি আছে। কোনো কুঠারিতে শব্দের, কোনোটিতে গন্ধের, কোনটিতে আলোকের, আবার কোনটিতে স্বাদের উত্তেজনা গিয়া

হাজির হয়। বাজারের কোনো দোকানে যেমন সোনারূপা, কোনো দোকানে চাল্‌-দাল্‌, কোনো দোকানে মসলাপাতি, আবার কোনো দোকানে যেমন কাপড়-জামার কেনা-বেচা চলে, এ যেন ঠিক্‌ সেই রকম ব্যাপার। তাই শব্দের উত্তেজনা এক রকম বিশেষ স্নায়ু দিয়া মস্তিষ্কের শব্দের কুঠারিতে পৌঁছিলে আমরা শব্দ শুনিতে পাই।

মনে কর, খেলার ছোটো পিস্তলে ক্যাপ লাগাইয়া তোমরা যেন একটা আওয়াজ্‌ করিলে। এই শব্দ কি রকমে শুনা যায় দেখা যাউক। ক্যাপের ভিতরে একটু বারুদ ছিল, তাহা আঘাত পাইয়া জ্বলিয়া উঠিল এবং সেই সঙ্গে চারিপাশের বাতাসে ধাক্কা দিল। ধাক্কা পাইয়া বাতাসের অবস্থা কি হইবে ভাবিয়া দেখ। ধাক্কায় চারিপাশের বাতাস একটু সম্মুখে আগাইয়া গেল এবং সেখানকার বাতাসকে ধাক্কা দিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তাহা হইলে দেখ, পিস্তলের কাছের বাতাসে দূরের বাতাস ধাক্কা পাইল। কিন্তু এখন এই দূরের বাতাস স্থির থাকিতে পারিবে কি? কখনই স্থির থাকিবে না। তাহাও আগেকার বাতাসের মতো নিজের সম্মুখের বাতাসকে ধাক্কা দিয়া তবে স্থির হইবে। এই রকমে পিস্তলের ক্যাপের কাছের বাতাসে তাহার সম্মুখের বাতাস পরে পরে ধাক্কা পাইয়া পিস্তলের উপরের নীচের এবং চারিদিকের বাতাসে একটা ঢেউয়ের সৃষ্টি করিবে।

পিস্তলের বারুদ পুড়িয়া কি রকমে বাতাসে ঢেউয়ের

সৃষ্টি করিল. তোমরা তাহা বুঝিলে কি ? বোধ হয় বুঝিলে না। মনে কর, তোমরা পাঁচ ছয়জন বন্ধুতে মিলিয়া সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছ। তুমি আছ যেন সকলের পিছনে। তোমার সাম্‌নে আছে রাম, রামের সাম্‌নেআছে বিভূতি, আবার বিভূতির সাম্‌নে আছে কুমুদ। তুমি সকলের পিছনে আছ। মনে কর, পিছনে দাঁড়াইয়া আমি তোমার পিঠে যেন জোরে ধাক্কা দিলাম। ধাক্কা খাইলে তোমার অবস্থা কি হইবে ভাবিয়া দেখ। ধাক্কার চোটে তুমি রামের গায়ে ঝুঁকিয়া পড়িবে। তোমার ধাক্কা খাইয়া রাম বিভূতির গায়ে পড়িয়া ধাক্কা দিবে। আবার বিভূতি কুমুদের গায়ে ধাক্কা দিবে। ধাক্কার জোর যদি বেশী হয়, তবে বেচারা কুমুদই সাম্‌নে হুম্‌ড়াইয়া পড়িবে। তোমার, রামের এবং বিভূতির কিছুই হইবে না। তোমরা একের ধাক্কা আর একজনের গায়ে দিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইবে। তাহা হইলে দেখ, যেন একটা ধাক্কার ঢেউ তোমার কাছ হইতে আরম্ভ করিয়া কুমুদের কাছে গিয়া পৌঁছিবে।
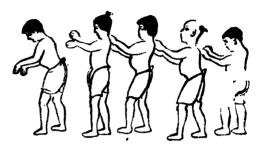
পিস্তলের আওয়াজ করিলে, হাততালি দিলে, কথা বলিতে গেলে, শিষ্‌ দিলে, অর্থাৎ যে-কোনো শব্দ করিতে গেলে

চারিদিকের বাতাসে ঠিক এই রকমই ঢেউ দেখা দেয়। ইহাকেই বলে শব্দের ঢেউ বা শব্দ-তরঙ্গ।

আর একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা ভালো করিয়া বুঝিবে। দেখ, ছবিতে কতকগুলি কাঠের বল সাজানো আছে। তুমি যেন প্রথম বলটিকে টানিয়া ছাড়িয়া দিলে। এখন কি হইবে ভাবিয়া দেখ, প্রথমটি ছুটিয়া আসিয়া দ্বিতীয়কে ধাক্কা দিবে, দ্বিতীয়টি তৃতীয়ের গায়ে ধাক্কা লাগাইবে, আবার তৃতীয় চতুর্থের গায়ে ধাক্কা মারিবে। এই রকমে একের ধাক্কা পর পর অপরের গায়ে লাগিতে থাকিবে। কিন্তু ইহাতে কেহই নিজের জায়গা ছাড়িবে না। বিশেষ লক্ষ্য করিলে এই মাত্র দেখিবে,ধাক্কা দিবার সময়ে প্রত্যেক বল্ একটু করিয়া নড়িতেছে বটে, কিন্তু ধাক্কা দেওয়া শেষ হইলেই নিজের জায়গায় স্থির হইয়া দাঁড়াইতেছে।
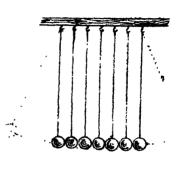
শব্দ করিবার সময়ে কোনো জায়গার বাতাস আলোড়িত হইলে, তাহা কাছের বাতাসকে ধাক্কা দিয়া এই রকমেই শব্দের ঢেউ উৎপন্ন করে। এই ঢেউ যখন কানের ভিতরকার বাতাসে পৌঁছিয়া কানের যন্ত্রে ধাক্কা দেয়, তখন সেখানকার স্নায়ু উত্তেজিত হইয়া পড়ে। তার পরে ঐ উত্তেজনা মস্তিষ্কে পৌঁছিলে আমরা শব্দ শুনিতে পাই।

জলের ঢেউয়ের সঙ্গে শব্দের ঢেউয়েয় তুলনা করা যায়। মনে কর, জ্যৈষ্ঠ মাসের গুমট দিনে সব নিস্তব্ধ। একটুও বাতাস নাই। পুকুরের জল স্থির আছে। কোথাও একটু ঢেউ নাই। তুমি যেন সেই জলে একটা ঢিল ফেলিয়া দিলে। ইহাতে জলের অবস্থা কি হয়, তোমরা দেখ নাই কি? যেখানে ঢিল পড়ে সেখানকার জল একটু নড়াচড়া করে। তার পরে সেই জায়গার চারিদিকে চাকার মতো ঢেউ একটির পরে একটি চলিতে আরম্ভ করে এবং শেষে সেই ঢেউ তোমাদের ঘাটের সিঁড়িতে আসিয়া ধাক্কা দেয়।

তোমরা হয়ত মনে কর, যেখানে ঢিল ফেলা গেল, সেখানকারই জল ঢেউয়ের আকারে ধীরে ধীরে আসিয়া সিঁড়িতে ধাক্কা দেয়। কিন্তু তাহা নয়। জল এক জায়গায় দাঁড়াইয়া উঁচু-নীচু হইতে থাকে এবং সেই কাঁপুনির ধাক্কার কাছের জল কাঁপিয়া ঢেউয়ের সৃষ্টি করিতে থাকে। অর্থাৎ জলের কণাগুলি নিজেদের জায়গাতে দাঁড়াইয়া যেন উঠা-নামা করে, একটুও আগাইয়া যায় না। তোমরা যদি ভালো করিয়া দেখ, তবে জানিতে পারিবে, পুকুরের জলে যে ফুল বা লতাপাতা ভাসিতে থাকে, তাহা জলের ঢেউয়ে দূরে যায় না। ঢেউয়ের জল যেমন উঠা-নামা করে সেইগুলিও এক জায়গায় দাঁড়াইয়া জলের সঙ্গে তালে তালে উঁচু-নীচু হয় মাত্র।

পুকুরের জলের কোনো জায়গায় ঢিল ফেলিলে জলে যেমন ঢেউ উঠে, তোমাদের স্কুলের পেটা ঘড়িতে মুগুরের

ঘা দিলে, বাঁশী বাজিলে, বা তোমাদের পোষা কুকুরটি ভেউ ভেউ করিয়া ডাকিলে, চারিপাশের বাতাসে যেন সেই রকমেরই ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। বাতাস দেখা যায় না। কাজেই তাহার ঢেউও দেখা যায় না। দেখা গেলে জানিতে পারিতে, পাখীর ডাকে, মানুষের চীৎকারে, গাড়ীর ঘড়ঘড়ানিতে এবং আরো কত শব্দের ঢেউয়ে সমস্ত আকাশটা যেন ভরিয়া আছে। যখন বোমার আওয়াজে, কামানের গর্জ্জনে এবং মেঘের ডাকে ঘরের দরজা ও সার্সি ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া উঠে, কেবল তখনি বুঝা যায়, কি যেন ধাক্কা দিয়া সার্সি ও দরজা কাঁপাইতেছে। ইহাই বাতাসের ঢেউয়ের ধাক্কা।

আমরা কাঠের বলের ধাক্কা, জলের ঢেউ ইত্যাদি অনেক ব্যাপারের সহিত শব্দের ঢেউয়ের তুলনা করিলাম। কিন্তু শব্দের ঢেউ ঠিক জলের ঢেউয়ের মতো নয়। সেতারের তারের বা ঘণ্টার কাঁপুনি যে কি রকম, তাহা চোখে দেখা যায় এবং

হাতে ছুঁইয়াও বুঝা যায়। মনে কর, আঙুলের ঘায়ে সেতার বা তানপুরার তার কাঁপিতেছে। এ অবস্থায় সেটি কি করে, তোমরা দেখ নাই কি? প্রত্যেক কাঁপুনিতে তারটি একবার আগে আসে, এবং পরেই আবার পিছনে হটিয়া যায়। কাজেই

আগে যাইবার সময়ে তাহা সাম্‌নের বাতাসকে ধাক্কা দেয়, এবং বাতাস সেই ধাক্কায় সংকুচিত হয়। আবার পিছু হটিবার সময়ে সেই ধাক্কা আল্‌গা হইয়া আসে, ইহাতে বাতাস প্রসারিত হয়। তার পরে জলের ঢেউয়ের মতো, বা সেই কাঠের বলের ধাক্কার মতো এই সংকোচন ও প্রসারণ বাতাসের ভিতর দিয়া ঢেউয়ের আকারে চলিতে থাকে; বাতাস চলে না, চলে কেবল ঢেউ। আশ্বিনের হাওয়ায় ধানের ক্ষেতে যে ঢেউ উঠে তাহাতে ধানের শিষ এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যায় না। ঢেউই চলে ধান-গাছের মাথার উপর দিয়া ধীরে ধীরে।

কোনো শব্দ করিতে গেলে কি রকমে বাতাস সংকুচিত ও প্রসারিত হইয়া ঢেউয়ের সৃষ্টি করে, এখানে তাহার একটা ছবি দিলাম। পূর্ব্ব-পৃষ্ঠার ছবিতে দেখ, একটা লোহার তার কাঁপিতেছে এবং তাহাতে বাতাস সংকুচিত ও প্রসারিত হইয়া ঢেউয়ের সৃষ্টি করিতেছে।

শব্দের বাহন

শব্দের ঢেউ-সম্বন্ধে আগে যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতে বোধ হয় তোমরা বুঝিয়াছ, বাতাস না থাকিলে শব্দ হয় না। বাতাসের ঢেউই শব্দের ঢেউ। এসম্বন্ধে একটা মজার পরীক্ষা আছে। কোনো কাচের পাত্র হইতে যন্ত্র দিয়া বাতাস বাহির করিয়া তাহার ভিতরে কলের ঘণ্টা বাজাইলে ঘণ্টার শব্দ কানে পৌঁছায় না। পাত্রে বাতাস থাকে না, তাই ঢেউ হয় না এবং শব্দও হয় না। পর-পৃষ্ঠায় তাহারি একটি ছবি দিলাম। দেখ, বায়ুহীন পাত্রের ভিতরে একটা প্রকাণ্ড ঘণ্টা রহিয়াছে। ঘণ্টার গায়ে বার বার মুগুরের ঘা পড়িতেছে, কিন্তু শব্দ শুনা যাইতেছে না। পাত্রে বাতাস প্রবেশ করাও, শব্দ শুনিতে পাইবে। তাহা হইলে দেখ, বাতাস না থাকিলে শব্দ হয় না। বাতাসই ঢেউয়ের আকারে আসিয়া কানে ধাক্কা দিলে শব্দ শুনা যায়। তাই বাতাসকে বলা হয় শব্দের বাহন।

তোমরা বোধ হয় মনে করিতেছ, বিদেশের পণ্ডিতরাই বুঝি শব্দ-সম্বন্ধে এই সব কথা আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু তাহা নয়। আমাদের দেশের প্রাচীন পণ্ডিতেরাও এগুলি বুঝিতেন। তাঁহারা বলিতেন, আকাশ নামে একটা জিনিষ সমস্ত শূন্যকে জুড়িয়া আছে। সেই আকাশের ঢেউ কানের

ভিতরে আসিয়া ঠেকিলে আমরা শব্দ শুনিতে পাই। তাহা হইলে দেখ, বাতাসই যে শব্দের ঢেউ বহিয়া আনে, তাহা আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা জানিতেন না। বোধ করি তখন

জানিবার উপায়ও ছিল না। কিন্তু কোন বাহক জিনিসের ঢেউই যে কানে ঠেকিয়া শব্দ-জ্ঞান জন্মায়, তাহা তাঁহারা বেশ জানিতেন।

কিন্তু কেবল বাতাসই কি শব্দের বাহন? নানা পরীক্ষায় জানা গিয়াছে, হাইড্রোজেন অক্সিজেন প্রভৃতি বাতাসের মতো [illegible] জিনিস আছে, সেগুলিতেও শব্দের ঢেউ জন্মে এবং তাহা কানে ঠেকিলে শব্দ শুনা যায়। খুব লম্বা লোহার বা কাঠের [illegible] এক প্রান্তে কান ঠেকাইয়া রাখ এবং ছুঁচ বা পিনের ডগা দিয়া অপর প্রান্তে কাহাকেও ধীরে ধীরে আঁচড় দিতে বল। বাতাস হইতে আঁচড়ের শব্দ শুনা যাইবে না, কিন্তু কাঠ বা লোহার ভিতর দিয়া শব্দ কানে পৌঁছিবে। ডুব দিয়া থাকিলে জলের ভিতরকার শব্দ কানে পৌঁছায়, ইহা তোমরা দেখ নাই কি? আমরা ছেলেবেলায় ডুব দিয়া জলের তলাকার শব্দ অনেক শুনিয়াছি। আফ্রিকার অসভ্য জাতিরা প্রায়ই পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করে। শত্রু আক্রমণ করিতে আসিতেছে কিনা বুঝিবার জন্য তাহাদের একটা মজার ফন্দি আছে। আক্রমণের সম্ভাবনা দেখিলেই তাহারা

শুইয়া মাটিতে কান পাতিয়া রাখে। অনেক দূরের শত্রুর পায়ের দাপট ও ঘোড়ার খুরের কাঁপুনি তখন মাটির ভিতর দিয়া কানে আসিয়া পৌঁছায়। ইহাতে তাহারা সাবধান হয়।

তাহা হইলে দেখ, মাটি কাঠ লোহা প্রভৃতি কঠিন জিনিষের ভিতরেও শব্দের ঢেউ হয় এবং তাহা কানে ধাক্কা দিলে বা কানের ভিতরকার বাতাসকে কাঁপাইলে আমরা শব্দ শুনিতে পাই। অর্থাৎ জল মাটি বাতাস ধাতু কাঠ সকল জিনিষই শব্দের বাহন। বাতাসেরই মতো সংকুচিত ও প্রসারিত হইয়া এগুলি ভিতরে ভিতরে শব্দের ঢেউ উৎপন্ন করে।

সূর্য্য কি প্রকাণ্ড জিনিষ, তাহা বোধ করি তোমরা জানো না। এই পৃথিবীর মতো তেরো লক্ষ পৃথিবী জোড়া না দিয়ে সূর্য্যকে গড়া যায় না। কেবল তাহাই নয়, সূর্য্যে নানা রকম বাষ্প দিবারাত্রি আগুনের মতো জ্বলিতেছে। এই আগুনের যে একটু তাপ পৃথিবীতে আসে, তাহাতেই পৃথিবী গরম থাকে, মেঘ হয়, বৃষ্টি হয়, বাতাস বহে এবং শস্য জন্মে। একটু জোরে বাতাস বহিলে গাছের পাতা কাঁপিয়া সন্ সন্ শব্দ করে। সূর্য্যে দিবারাত্রি যে-আগুনের ঝড় বহিতেছে, তাহাতে সেখানে যে কত শব্দ হয়, তাহা ভাবিয়াই ঠিক করা যায় না। আমরা যদি এখান হইতে সূর্য্যলোকে যাই, তাহা হইলে বোধ হয় হাজার হাজার বাজ পড়ার শব্দে আমাদের কান কালা হইয়া যায়। কিন্তু এই শব্দ আমরা পৃথিবীতে থাকিয়া একটুও শুনিতে পাই না। কেন ইহা ঘটে, এখন তোমরা নিজেরাই বলিতে পারিবে।

শব্দের ঢেউ উৎপন্ন করার মতো কোনো জিনিষই পৃথিবী ও সূর্য্যের মাঝামাঝি জায়গায় নাই। তোমরা হয়ত ভাবিতেছ মাঝে বাতাস আছে। বাতাস থাকে পৃথিবীর উপরে কুড়ি-পঁচিশ ক্রোশ পর্য্যন্ত। তা'র পরে মহাশূন্য। সেখানে খুব গলা ছাড়িয়া চেঁচাইলে শব্দ হয় না; হাজারটা কামান এক সঙ্গে ছাড়িলে একটুও আওয়াজ শুনা যায় না। মহাশূন্যে শব্দের বাহন কোনো জিনিষ নাই বলিয়া আমরা পৃথিবীতে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পারি। তাহা না হইলে সূর্য্যলোকের, বৃহস্পতি-লোকের এবং আরো কত গ্রহ-নক্ষত্রের নানা রকম শব্দে অস্থির হইয়া পড়িতাম।

দুধের চেয়ে ক্ষীর গাঢ়। গাইয়ের দুধের চেয়ে মহিষের দুধ গাঢ়। কাঠের চেয়ে লোহা গাঢ়। লোহার চেয়ে আবার সীসা গাঢ়। বাতাসেরও এ রকম গাঢ়তার কম-বেশী আছে। পৃথিবীর ঠিক মাটির উপরকার বাতাস আকাশের খুব উঁচু জায়গার বাতাস অপেক্ষা বেশী গাঢ়। উঁচু পাহাড়ের উপরকার বাতাস এত পাত্‌লা যে,তাহা টানিয়া নিশ্বাসের কাজ চলে না,—হাঁপ লাগে। আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া একদল ইংরেজ হিমালয় পর্ব্বতের উঁচু চূড়ায় উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন। সেখানকার বাতাস এতই পাত্‌লা যে, তাহা দিয়া নিশ্বাসের কাজ চালানো মুস্কিল হয়। তাই বড় বড় থলিতে তাঁহারা আক্সিজেন্ বাষ্প বোঝাই করিয়া লইয়াছিলেন। যাহারা উড়ো জাহাজে উঁচু জায়গায় উড়িয়া বেড়ায়, তাহাদেরও সঙ্গে অক্সিজেনের

থলি থাকে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, খুব উঁচু জায়গায় পাত্‌লা বাতাসে খুব কম শব্দ হয়। সেখানকার কামানের শব্দ যেন পট্‌কার আওয়াজের মতো শুনায়। তাহা হইলে দেখ, তোমরা যদি উড়ো-জাহাজে চাপিয়া মেঘের রাজ্যের উপরে উঠিতে পার, তাহা হইলে খুব চাৎকার না করিলে কেহ কাহারো কথা শুনিতে পাইবে না। সেখানে গাধার চাৎকার যেন চড়াই পাখীর কিচির-মিচিরের মতো শুনায়।

শব্দের প্রবলতা

কাছের শব্দ যত ভালো শুনা যায়, দূরের শব্দ সে-রকম শুনা যায় না। তোমরা দু'জনে মুখোমুখি বসিয়া কত গল্প করিতেছ। প্রত্যেক কথা বেশ শুনা যাইতেছে। পরস্পর দুই শত হাত তফাতে বসিয়া তোমরা ঐরকম গল্প করিতে পার কি? তখন উঁচু গলায় চীৎকার না করিলে কেহ কাহারো কথা শুনিতে পাইবে না। বোমার আওয়াজ অনেক দূরে থাকিয়া কি রকম শুনায়, তাহা তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছ। এই টেবিলখানির উপরে কিল মারিলে যে রকম শব্দ হয়, তাহা সেই রকমই শুনায়। যত দূরে যাওয়া যায়, সেই শব্দ আরো কমিতে থাকে। শেষে চারি-পাঁচ মাইল তফাতে বোমার শব্দ শুনাই যায় না। তাহা হইলে বুঝা গেল, যেখানে শব্দ হইতেছে, সেখান হইতে যত দূরে যাওয়া যায়, ততই সেই শব্দ কমিয়া আসে।

দূরত্ব-অনুসারে শব্দের প্রবলতা কেন কমিয়া আসে, একটা উদাহরণ দিলে বোধ করি তোমরা বুঝিতে পারিবে। মনে কর, কোন জায়গায় আমরা একটা পিস্তলের আওয়াজ করিলাম। বারুদ পুড়িয়া একটু শক্তির সৃষ্টি করিল এবং তাহাই বাতাসকে একটু তোলপাড় করিয়া শব্দের ঢেউ চালাইতে লাগিল। জলের

ঢেউ যেমন কেবল জলের উপর দিয়াই চলে, শব্দের ঢেউ সে-রকমে চলে না। যেখানকার বাতাস আলোড়িত হয়, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া ডাইনে-বামে, সাম্‌নে-পিছনে এবং উপরে-নীচে, অর্থাৎ সকল দিকেই বাতাসকে কাঁপাইয়া মণ্ডলাকারে ঢেউ ছুটিতে থাকে। ঢেউ যত দূরে যায়, মণ্ডলগুলিও তত বড় হয়। মনে কর, একটা খুব বড় ফুটবলের ভিতরে একটা ছোটো ফুটবল আছে এবং তাহারি ভিতরে যেন আরো ছোটো ছোটো অনেক ফুটবল পর পর সাজানো রহিয়াছে। ফুটবলগুলির যে-আকৃতি তাহার সহিত শব্দের ঢেউয়ের মণ্ডলের তুলনা করা যাইতে পারে। শব্দের ঢেউয়ের প্রথম মণ্ডলটা থাকে যেন বড় ফুটবলের ভিতরকার সব চেয়ে ছোটো ফুটবলের মতো। তা'র পরে ঢেউ যত দূরে যায়, ততই অন্য ফুটবলগুলির মতো ঢেউয়ের মণ্ডলগুলি একটু-একটু করিয়া বড় হইতে থাকে এবং সঙ্গে তাহাদের সঙ্গে পৃষ্ঠফলও বেশী হইতে আরম্ভ করে। ভাঁটার মতো বা ফুটবলের মতো মণ্ডলাকার জিনিষের পৃষ্ঠফল কি রকমে বাড়ে-কমে তাহা বোধ হয় তোমরা জানো না। হিসাব করিলে দেখা যায়, এক ইঞ্চি ব্যাসের ভাঁটার পৃষ্ঠফল যত, দুই ইঞ্চি ব্যাসের ভাঁটার পৃষ্ঠফল তাহারি চারিগুণ, তিন ইঞ্চি ব্যাসের ভাঁটায় নয়গুণ, চারি ইঞ্চি ব্যাসের ভাঁটায় ষোল গুণ ইত্যাদি হইয়া পড়ে। তাহা হইলে দেখ, পিস্তলের শক্তি এক ফুট তফাতে যে-পরিমাণ বাতাসকে ঠেলা দেয়, দুই ফুট তফাতে তাহারি চারিগুণ এবং তিন ফুট তফাতে তাহারি নয়গুণ

ইত্যাদি বাতাসকে ঠেলা দেয়। গাড়ির এন্‌জিন্‌ যখন দুইখানা গাড়ি সঙ্গে লইয়া চলে, তখন তাহার তেজ কত বেশী থাকে, তাহা তোমরা হয় ত দেখিয়াছ। সেখানি তখন যেন নক্ষত্রবেগে চোখের সম্মুখ দিয়া ছুটিয়া চলে। কিন্তু সেই এন্‌জিনেই যখন চল্লিশখানা মালগাড়ি জোড়া যায়,তখন তাহার আর সে-রকম তেজ থাকে না। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, কোনো শক্তি দিয়া বেশী কাজ আদায় করিতে গেলে, কাজ অল্প হয়। শব্দের ঢেউয়েও অবিকল তাহাই দেখা যায়। যে-শক্তি এক ফুট তফাতের বাতাসে শব্দের ঢেউ উৎপন্ন করিল, তাহাই যখন দুই ফুট তফাতে চারিগুণ বাতাসে ঢেউ উৎপন্ন করিতে যায়, তখন তাহাতে বেশী জোর দিতে পারে না। কাজেই প্রথম ঢেউয়ের শব্দের তুলনায়, দ্বিতীয় ঢেউয়ের শব্দের জোর চারি-ভাগের এক-ভাগ মাত্র হইয়া দাঁড়ায়। এই রকমে তিন ফুট তফাতে নয় ভাগের একভাগ, চারি ফুট তফাতে যোল ভাগের একভাগ, ইত্যাদি হিসাবে শব্দের জোর কমিতে থাকে; এবং কমিতে কমিতে অনেক দূরে শব্দের পরিমাণ এত অল্প হইয়া পড়ে যে, তাহা শুনাই যায় না।

তাহা হইলে দেখ, দূরত্ব-অনুসারে শব্দ কমিয়া আসার একটা ধরাবাঁধা নিয়ম আছে। তোমাদের চণ্ডীমণ্ডপে জোরে পূজার ঢাক বাজিতেছে। একশত হাত তফাতে দাঁড়াইয়া তুমি যতটা আওয়াজ শুনিবে,দুইশত হাত তফাতে তাহারি চারিভাগের এক ভাগ, তিনশত হাত তফাতে নয়ভাগের এক ভাগ, চারিশত

হাত তফাতে ষোল ভাগের এক ভাগ, শব্দ কানে আসিতে থাকিবে। এই রকম কমিতে কমিতে বেশী দূরে শব্দ এত অল্প হইয়া দাঁড়াইবে যে, তোমরা তাহা শুনিতেই পাইবে না।

শব্দের জোর বাড়া-কমার সম্বন্ধে একটি মাত্র কারণ তোমাদিগকে বলিলাম। কিন্তু ইহা ছাড়া আরো কারণ আছে। সেগুলিও জানিয়া রাখা ভালো।

তোমরা আগেই শুনিয়াছ, কোন জিনিষ কাঁপিয়া বাতাসকে না কাঁপাইলে শব্দের ঢেউ হয় না এবং শব্দও হয় না। নানা পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, জিনিষ যত বেশী এ-পাশে ও-পাশে নড়িয়া কাঁপে, তাহার শব্দও তত বেশী হয়। তোমরা ইহা দেখ নাই কি? এস্‌রাজ, সেতার, তানপুরা বা একতারার একটি তারকে জোরে টানিয়া ছাড়িয়া দাও। এই অবস্থায় তারটি এ-পাশে এবং ও-পাশে অনেক দূর পর্য্যন্ত গিয়া কাঁপিবে এবং খুব জোর আওয়াজ শুনা যাইবে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর, দেখিবে যেমন তারের কাঁপুনির পরিসর কমিয়া আসিতেছে তেমনি শব্দও মৃদু হইয়া আসিতেছে। পেটা-ঘড়িতে মুগুর পিটাইয়া শব্দ করা গেল। এই অবস্থায় ঘড়িটা যে কাঁপে তাহা চোখে দেখা যায়, এবং গায়ে হাত ছুঁয়াইলে জানা যায়। কাঁপুনির পরিসর বেশী, তাই শব্দও বেশী শুনা গেল। একটু অপেক্ষা কর। দেখ, এখন ঘড়ির সে-রকম কাঁপুনি নাই এবং শব্দও সে-রকম প্রবল নাই। সুতরাং বলা যায়, কাঁপুনির পরিসর যত বেশী হয়, শব্দও তত প্রবল, অর্থাৎ জোরালো হয়।

যে জিনিষ কাঁপিয়া শব্দ উৎপন্ন করে, তাহা আকারে যত বড় হয়, তাহার শব্দও তত প্রবল হয়। ইহা তোমরা লক্ষ্য কর নাই কি? দুইটা বাটি আছে। একটা তেল-মাখার ছোটো কাঁসার বাটি, আর একটি বড় জামবাটি। মনে কর, তোমরা দুইটাকেই কাঠির আঘাতে কাঁপাইলে। দুইটা বাটিই কাঁপিতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে দুই রকম শব্দ বাহির হইতে লাগিল। কোন্ শব্দটা বেশী জোরালো হইবে তোমরা বলিবে পার কি? তেল-মাখার ছোটো বাটি হইতে মিন্‌মিনে শব্দ বাহির হইবে, কিন্তু জামবাটির শব্দ হইবে ভয়ানক জোরালো। হয় ত দুই শত হাত তফাতের লোকেও তাহা শুনিতে পাইবে। তাহা হইলে দেখ, জিনিষ যত বড় হয়, তাহার কাঁপুনিতে শব্দও তত প্রবল হয়। এই জন্যই পূজার ছোটো ঘণ্টা এ-বাড়ীতে বাজাইলে ওবাড়ী হইতে তাহার শব্দ শুনা যায় না। কিন্তু গির্জ্জার মাথায় বড় ঘণ্টা বাজাইলে তাহার শব্দ সহরের সব লোকেই শুনিতে পায়। কাঁশির শব্দ বেশী হয় না, কিন্তু কাঁসরের শব্দ বেশী হয়। কেন এমন হয়? 'ছোটো জিনিষ কাঁপিয়া বাতাসে যে শব্দের ঢেউ উৎপন্ন করে, তাহার পরিসর অল্প। বড় জিনিষ কাঁপিয়া বাতাসে যে ঢেউ তোলে, তাহা পরিসরে বেশী। কাজেই বড় জিনিষই ছোটো জিনিষের চেয়ে জোরালো ঢেউ উৎপন্ন করে, এবং জোরালো ঢেউয়ের শব্দও জোরালো হয়।'

কাঠের উপরে দুইটা পেরেক পুঁতিয়া তাহাতে একটি

লোহা বা পিতলের তার টানিয়া বাঁধ। এখন এই তারটিকে টানিয়া ছাড়িয়া দিলে শব্দ হইবে। আমরা ছেলেবেলায় পেরেকে তার বাঁধিয়া এই রকম বাজনার যন্ত্র তৈয়ার করিতাম। কিন্তু এই যন্ত্রের তার জোরে বাজে না। শব্দ এত মিন্‌মিনে হয় যে, তারের কাছে কান না রাখিলে তাহা শুনা যায় না। এই রকম তারকে একটা বাক্সের উপরে রাখিয়া বাজাইতে থাক। এখন দেখিবে, সেই তার হইতে এমন শব্দ বাহির হইতেছে যে, তাহা চারি-পাঁচ হাত তফাৎ হইতেও শুনা যাইতেছে। কেন এমন হয়, তোমরা বোধ হয় তাহা জানো না। বাক্সের কাঠ এবং তাহার ভিতরকার বাতাস, তারের কাঁপুনিতে কাঁপিয়া উঠে এবং তার যেমন শব্দের ঢেউ উৎপন্ন করিতেছিল, বাক্সের কাঠ ও বাতাস অবিকল সেই রকম কাঁপিয়া জোরালো শব্দ উৎপন্ন করে। কাজেই তখন তারের শব্দ অনেক গুণে বাড়িয়া যায়।

তোমরা বোধ হয় মনে কর, সেতার ও তানপুরার পিছনে যে লাউয়ের প্রকাণ্ড খোল থাকে তাহা যন্ত্রের শোভা-বৃদ্ধির জন্য। কিন্তু তাহা নয়। তারে ঘা দিলে যে দুর্ব্বল শব্দের ঢেউ হয়, লাউয়ের তুম্বী ও তাহার ভিতরকার বাতাস জোরে কাঁপিয়া সেই রকমের মিষ্ট অথচ জোরালো সুর উৎপন্ন করে। ঢাক ঢোল বেহালা সারিন্দা ডাইনে বাঁওয়া প্রভৃতি সকল বাদ্যযন্ত্রের খোলও ঠিক ঐ কাজ করে। ঢাকে কাঠি দিলে যে শব্দটা এক ক্রোশ তফাৎ হইতে শুনা যায়, তাহার ঢেউ কেবল চামড়া

কাঁপিয়া উৎপন্ন করে না। ঢাকের খোলের কাঠ ও তাহার ভিতরকার বাতাস চামড়ার কাঁপুনিতে যখন জোরে কাঁপিয়া উঠে, তখনি শব্দ প্রবল হয়।

তাহা হইলে দেখা গেল, কোন আবরণের ভিতরে যদি বাতাস আবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে সেই আবরণ ও তাহার ভিতরকার বাতাস কাঁপিয়া শব্দের ঢেউকে জোরালো করিতে পারে। এই ঢেউয়ের শব্দ অনেক দূরে থাকিয়াও শুনা যায়।

শব্দের বেগ

দূরে মাঠের এক কোণে গিয়া তোমাদের মধ্যে কেহ যদি ফুট্‌বলে কিক্‌ কর, তবে দেখিবে কিকের সঙ্গে তাহার শব্দ কানে আসিতেছে না। বলে পা ঠেকিল, বল্‌ লাফাইয়া উঠিল, তার পরে শব্দ কানে আসিল। কেহ দূরে কুড়ুল দিয়া কাঠ কাটিতেছে, কুড়ুলের ঘা লাগার অনেক পরে তাহার শব্দ কানে আসিল। তোমরা এগুলি লক্ষ্য কর নাই কি? যদি না করিয়া থাক, তবে আজই মাঠে খেলার সময়ে বেশী দূরে দাঁড়াইয়া কাহাকেও ফুটবল্‌ কিক্‌ করিতে বলিয়ো, দেখিবে কিক্‌ দেওয়ার অনেক পরে, তাহার শব্দ কানে পৌঁছিতেছে। আমাদের বাড়ীর সম্মুখে ধোবারা কাপড় কাচিত। দেখিতাম, পাটে কাপড় আছ্‌ড়াইবার অনেক পরে, তাহার শব্দ শুনা যাইত।

এই সকল পরীক্ষা হইতে বুঝা যায়, এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় ছুটিয়া যাইতে যেমন আমাদের একটু সময় লাগে, এক ষ্টেশন হইতে অন্য ষ্টেশনে যাইতে রেলগাড়ী যেমন একটু সময় লয়, সেই রকম এক জায়গার শব্দ যখন অন্য জায়গায় যায়, তখন তাহারো একটু সময়ের দরকার হয়। মেঘে বিদ্যুৎ চম্‌কাইল, কিন্তু তোমরা মেঘের ডাক শুনিলে বিদ্যুৎ চম্‌কানোর

একটু পরে। বিদ্যুতের সঙ্গেই মেঘ ডাকে, তবে কেন বিলম্বে শব্দ শুনা যায়? তোমরা বোধ হয় এখন ইহার উত্তর আপনারাই দিতে পারিবে। মেঘ থাকে আকাশের দুই-তিন মাইল উপরে, তাই এতটা পথ আসিতে শব্দের ঢেউয়ের কিছু সময় লাগে। এই জন্যই বিদ্যুৎ চম্‌কাইবার একটু পরে শব্দ কানে পেঁছায়।

কত বেগে বাতাসের ভিতর দিয়া শব্দের ঢেউ চলে, তাহা বোধ হয় তোমরা জানো না। ইহা লইয়া নানা দেশের পণ্ডিতেরা নানা পরীক্ষা ও হিসাব করিয়াছেন। এই সব হিসাব হইতে জানা যায়, শব্দের ঢেউ প্রতি সেকেণ্ডে ১১০০ ফিট্ অর্থাৎ ৭৩৩ হাত বেগে চলে। অর্থাৎ তোমরা যদি দুই হাজার ফুট তফাতে দাঁড়াইয়া ঢাকের বাদ্য শুনিতে থাক, তাহা হইলে ঢাকে কাঠি দেওয়ার প্রায় দুই সেকেণ্ড পরে তাহার শব্দ শুনিতে পাইবে। সুতরাং বলিতে হয়, ও-পাড়ায় যখন ঢাক বাজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তখন সেই ঢাকের শব্দ তোমাদের কানে পৌঁছায়। মজার ব্যাপার নয় কি?

পশ্চিমে ভয়ানক মেঘ করিয়াছে, কড়্ কড়্ শব্দে বাজ পড়িতেছে। তুমি ঘড়ি খুলিয়া দেখিলে একবার বিদ্যুৎ চম্‌কাইবার ছয় সেকেণ্ড পরে যেন মেঘের ডাক শুনা গেল। সুতরাং বলা যায়, ১১০০ ফিটের ছয়গুণ—অর্থাৎ ৬৬০০ ফিট—অর্থাৎ ৪৪০০ হাত তফাতে মেঘে শব্দ করিয়াছিল। এই রকমে বিদ্যুৎ চমকানো দেখিয়া ও মেঘের ডাক শুনিয়া আমরা ছেলেবেলায় মেঘের দূরত্ব হিসাব করিতাম। বেশ মজা লাগিত। তাহা

হইলে দেখ, বিদ্যুতের সঙ্গে-সঙ্গেই যখন মেঘের ডাক শুনা যায়, তখন বুঝিতে হয়, মেঘ খুব কাছে থাকিয়া ডাকিতেছে।

শব্দ সকল সময়েই কি একই বেগে বাতাসের ভিতর দিয়া চলে? হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, বাতাসের নানা অবস্থায় শব্দের বেগ নানা রকম হয়। ঠাণ্ডা বাতাসের চেয়ে গরম বাতাসের ভিতর দিয়া শব্দের ঢেউ তাড়াতাড়ি চলে। কিন্তু এই বেগ-বৃদ্ধি তোমরা হঠাৎ লক্ষ্য করিতে পারিবে না। বাতাস যেমন এক-এক ডিগ্রি গরম হয়, তেমনি শব্দের বেগ সেকেণ্ডে কেবল দুই ফুট করিয়া বেশী হয়। তাই সাধারণ গরম বাতাসে শব্দের বেগ ১১০০ বদলে ১১২০ ফিট্ করিয়া ধরা হইয়া থাকে।

শব্দের ঢেউ সকল রকম বাষ্প তরল ও কঠিন জিনিষের ভিতর দিয়া চলে, ইহা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। কিন্তু সব জিনিষে একই বেগে শব্দ চলে না।

এখানে একটা তালিকা দিলাম। কোন্ জিনিষের ভিতরে সেকেণ্ডে কত ফিট্ বেগে শব্দ চলে তোমরা তালিকা দেখিলেই জানিতে পারিবে।

কয়লার বাষ্প	...	১,৬০৭	ফিট্
অক্সিজেন	...	১,০৪০	„
হাইড্রোজেন	...	৪,১৬৩	„
অঙ্গারক বাষ্প	...	৮৫৬	„
রবার	...	২০০	„

জল	...	৪,৭০০	"
কাঠ	...	১০,৯০০	"
সীসা	...	৪,৬৫৩	"
তামা	...	১২,১৮৪	"
কাচ	...	১৬,০৫৭	"

তাহা হইলে দেখ, বাতাসে যে-বেগে শব্দের ঢেউ চলে, জলের ভিতরে তাহারি প্রায় চারি গুণ বেগে শব্দ চলাফেরা করে; আবার কাচের ভিতরে চলে তাহারি ষোল গুণ বেগে। কেন এমন হয়, তাহা বোধ করি তোমরা জানো না। এই বিষয়টি বুঝিতে হইলে শব্দের ঢেউ কি-রকমে উৎপন্ন হয়, তাহা মনে রাখিতে হইবে। এ সম্বন্ধে তোমাদিগকে আগে অনেক কথা বলিয়াছি। আবারও বলিতেছি।

আগে সেতার ও তানপুরার তার-সম্বন্ধে যে-কথা বলিয়াছি তাহা মনে করিয়া দেখ। তারে ঘা লাগিলেই তাহা বার বার কাঁপিতে থাকে। এই কাঁপুনি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, প্রত্যেক কম্পনে তারটি একবার সামনে সরিয়া গিয়া আবার কিছু হটিয়া আসে। এই আগে-যাওয়া ও পিছু-হটা বার বার চলে। ইহাতে কাছের বাতাসের অবস্থা কি হয়, তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? আগে যাইবার সময়ে তার কাছের বাতাসকে ঠেলিয়া চাপ দেয়। ইহাতে বাতাস একটু সংকুচিত হয়। আবার পিছু-হটিবার সময়ে তারের সেই চাপই আল্‌গা হয়। তখন বাতাস আল্‌গা পাইয়া প্রসারিত হয়। তাহা হইলে

বুঝা যাইতেছে, তারের প্রত্যেক কাঁপুনিতে কাছের বাতাস একবার সংকুচিত এবং আর একবার প্রসারিত হয়। এই যে সংকোচন ও প্রসারণ, তারের সম্মুখে-পিছনে বামে-ডাহিনে উপরে-নীচে সব দিকের বাতাসেই ঢেউয়ের আকারে চলিতে থাকে। ইহাই শব্দের ঢেউ। এই ঢেউ-ই সংকোচন ও প্রসারণের আকারে সেকেণ্ডে ১,১০০ ফিট বেগে ছুটিয়া চলে।

তাহা হইলে দেখ, চাপে সংকুচিত হওয়া এবং আল্‌গা পাইলে প্রসারিত হওয়ার উপরেই শব্দের বেগ সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যে-জিনিষ সংকুচিত হইয়া তাড়াতাড়ি প্রসারিত হয়, তাহার ভিতর দিয়াই শব্দ তাড়াতাড়ি চলে। চাপ পাইলে সংকুচিত হওয়া এবং আল্‌গা পাইলে প্রসারিত হওয়ার এই গুণটিকেই বলা হয় স্থিতিস্থাপকতা। এই স্থিতিস্থাপতা যাহার বেশি তাহারি ভিতর দিয়া শব্দ তাড়াতাড়ি চলে। তোমার বোধ হয় মনে কর, রবার টানিলে খুব লম্বা হয় এবং ছাড়িয়া দিলে পূর্ব্বের আকার ফিরিয়া পায়। অতএব রবারই সব জিনিষের চেয়ে স্থিতিস্থাপক। কিন্তু তাহা নয়। টানিয়া ছাড়িয়া দিলে রবার পূর্ব্বের আকার ঠিক্ ফিরিয়া পায় না। তোমরা মোজার সঙ্গে যে রবারের গার্ডার ব্যবহার কর, তাহা ক্রমে কত আল্‌গা হইয়া যায়, ইহা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। রবার সর্ব্বাপেক্ষা স্থিতিস্থাপক হইলে ইহা ঘটিত না। রবারের চেয়ে কাচের স্থিতিস্থাপকতা অনেক বেশি। কিন্তু সীসা, কাদা প্রভৃতির

স্থিতিস্থাপকতা খুব কম। আবার তেল, জল, বাতাস প্রভৃতির স্থিতিস্থাপকতা খুব বেশি।

আগে শব্দের বেগের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখিলে মনে হয়, জিনিষ যত গাঢ় হয় তাহার ভিতর দিয়া শব্দ বুঝি ততই দ্রুত চলে। আসল ব্যাপার কিন্তু তাহারি উলটা। জিনিষ যত গাঢ় হয়, তাহার ভিতর দিয়া শব্দ ততই অল্প বেগে চলে। তাহা হইলে বুঝা গেল, যাহার স্থিতিস্থাপকতা বেশি এবং গাঢ়তা কম, তাহারি ভিতর দিয়া শব্দ তাড়াতাড়ি চলে। কাচের স্থিতিস্থাপকতা বেশি এবং গাঢ়তা কম, তাই তাহার ভিতর দিয়া শব্দ সেকেণ্ডে ষোল হাজার ফিটেরও বেশি যায়। সীসার গাঢ়তা কাচের গাঢ়তার প্রায় পাঁচ গুণ, কিন্তু তাহার স্থিতিস্থাপকতা বড় কম। তাই তাহার ভিতর দিয়া শব্দ সেকেণ্ডে কেবল ৪,৬২৩ ফিট বেগে চলে। বাতাসের এবং হাইড্রোজেনের স্থিতিস্থাপকতা একই। কিন্তু বাতাসের তুলনায় হাইড্রোজেনের গাঢ়তা অনেক কম। তাই প্রতি সেকেণ্ডে শব্দের ঢেউ বাতাসের ভিতরে ১১০০ ফিট করিয়া চলে, কিন্তু তাহাই হাইড্রোজেনে চলে ৪,১৬৩ ফিট বেগে।

প্রতিধ্বনি

খোলা মাঠের মাঝে দাঁড়াইয়া তুমি গলা ছাড়িয়া চীৎকার করিলে, একটু পরে তোমারি গলার সুরের আর একটা সেই রকম শব্দ কানে আসিল। বোধ হইল, কে একজন যেন দূরে দাঁড়াইয়া তোমাকেই ভ্যাঙচাইয়া চীৎকার করিতেছে। ইহাকেই আমরা প্রতিধ্বনি বলিতেছি। এই রকম প্রতিধ্বনি তোমরা শুন নাই কি? যদি না শুনিয়া থাক, তবে তোমাদের গ্রামের বাহিরে মাঠে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়ো, প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইবে। শব্দের ঢেউয়ে বাধা দিতে পারে, এমন কোনো বাড়ি, দেওয়াল বা উঁচু ঢিবি একটু দূরে থাকা চাই। তাহা হইলে প্রতিধ্বনি ভালো হইবে। আমাদের বাড়ির পুকুরের পাড়, খুব উঁচু ছিল। ছেলেবেলায় স্নান করিতে গিয়া খুব চীৎকার করিতাম। চীৎকারের প্রতিধ্বনি ঘুরিয়া-ফিরিয়া বার বার কানে আসিত। তোমরা কোনো সুবিধা মতো জায়গায় চীৎকার করিয়া পরীক্ষা করিলে একবারের চীৎকারে অনেক প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইবে।

রবারের বল্ জোরে দেওয়ালের গায়ে ছুড়িলে তাহা দেওয়াল হইতে ঠিক্‌রাইয়া হাতে আসিয়া পড়ে। বাহিরে দাঁড়াইয়া

আয়নার উপরে রৌদ্র ফেলিলে, তাহা আয়নায় ঠিক্‌রাইয়া ঘরের ভিতরে আসে। আমরা আয়নায় রোদ ফেলিয়া এই রকমে যে কত খেলা করিয়াছি তাহা আজো মনে আছে। তোমরাও হয় ত এরকম রোদের খেলা করিয়াছ। যাহাকে প্রতিধ্বনি বলা হইল, তাহা এই রকমে ঠিক্‌রাইয়া আসা শব্দ ছাড়া আর কিছুই নয়।

মনে কর, বেশ খোলা জায়গায় একটা বাড়ি আছে। তুমি সেই বাড়ি হইতে ষাট বা সত্তর হাত তফাতে দাঁড়াইয়া যেন 'হোঃ' করিয়া একটা শব্দ করিলে। তোমার মুখের

কাছ হইতে আরম্ভ করিয়া সেই শব্দের ঢেউ উপর-নীচের এবং আশ-পাশের বাতাসের ভিতর দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। এই ঢেউ যাহার কানে গেল সে শব্দ শুনিল, যাহার কানে গেল না, সে শব্দ জানিতে পারিল না। কিন্তু তোমার গলা হইতে যে-ঢেউগুলি সেই বাড়ির গায়ে ঠেকিল, সেগুলি

দেওয়ালে ঠিক্‌রাইয়া রবারের বলের মতো তোমারি দিকে ছুটিতে লাগিল। তার পরে তাহা যখন তোমার কানে গিয়া ধাক্কা দিল, তখন তুমি তোমারি গলার সেই শব্দটি সুস্পষ্ট শুনিতে পাইলে। পুকুরের স্থির জলে ঢিল ফেলিলে, জল চঞ্চল হইয়া উঠে। তার পরে একের পর এক সারি-বাঁধা ঢেউ চারিদিকে ছুটিয়া চলে। কিন্তু এগুলির মধ্যে যে-কয়েকটি তোমাদের পুকুরের বাঁধা-ঘাটের সিঁড়িতে ধাক্কা পায়, তাহারা কোন্ পথে চলে তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ কি? লক্ষ্য করিয়ো, দেখিবে ঢেউ-গুলি ধাক্কা খাইয়া মুখ ফিরাইবে এবং মাঝ-জলের যেখানে তুমি ঢিল ফেলিয়াছিলে সেই দিকেই চলিতে থাকিবে। এই রকম জলের ঢেউয়ের সঙ্গে শব্দের তুলনা করা যাইতে পারে। পুকুরের মাঝে ঢিল ফেলিলে যেমন জলের ঢেউ কিনারায় ধাক্কা পাইয়া মাঝেই ফিরিয়া আসিতে চায়, তেমনি তোমার চীৎকারের ঢেউ প্রাচীর বা অন্য কিছুতে ধাক্কা পাইয়া আবার তোমারি কানে আসিয়া হাজির হয়। ইহারি ফলে তোমরা প্রতিধ্বনি শুনিতে পাও।

কোনো প্রাচীর বা দেওয়ালের খুব কাছে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিলে প্রতিধ্বনি শুনা যায় না, কিন্তু একটু দূরে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিলে সেই দেওয়ালই প্রতিধ্বনি উৎপন্ন করে। তোমরা ইহা লক্ষ্য কর নাই কি? কত দূরে দাঁড়াইয়া শব্দ করিলে তাহার প্রতিধ্বনি শুনা যায়, সে-সম্বন্ধে একটা মজার হিসাব আছে। তোমাদিগকে এখন তাহারি কথা বলিব।

ঠাণ্ডা বাতাসে শব্দের ঢেউ সেকেণ্ডে ১,১০০ ফিট বেগে চলে, ইহা তোমরা অনেক বার শুনিয়াছ। কিন্তু সাধারণ গরম বাতাসে সেকেণ্ডে প্রায় ১,১২০ ফিট বেগে শব্দের ঢেউকে চলিতে দেখা যায়। এই কথাটি তোমাদের মনে রাখিতে হইবে। তা ছাড়া একবার চট্ করিয়া হাততালি দিতে, একবার পিস্তলের আওয়াজ করিতে, অথবা "ক" "খ" "হো" "হা" এই রকম এক-মাত্রার শব্দ উচ্চারণ করিতে কতটা সময় লাগে, তাহাও তোমাদের জানিয়া রাখিতে হইবে। পরীক্ষা করিয়া দেখিয়ো, "ক" "খ" "গ" এই রকম এক-একটা শব্দ উচ্চারণ করিতে এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময় লাগিতেছে। অর্থাৎ "ক" "খ" "গ" ইত্যাদি দশটা অক্ষর উচ্চারণ করিতে গেলে এক সেকেণ্ডের কম সময়ে চলে না।

এখন মনে কর, কোনো প্রাচীরের কাছ হইতে ৫৬ ফিট দূরে দাঁড়াইয়া তুমি যেন চট্ করিয়া "ক" অক্ষরটি উচ্চারণ করিলে। উচ্চারণ শেষ হইতে সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময় লাগিল। এই সময়ের মধ্যে শব্দের ঢেউ কি করিল ভাবিয়া দেখ। তাহা তোমার কাছ হইতে ৫৬ ফিট তফাতে দেওয়ালে ধাক্কা খাইল এবং সেখান হইতে ঠিক্‌রাইয়া আবার ৫৬ ফিট পথ চলিয়া তোমার কানে প্রবেশ করিল। শব্দের ঢেউকে চলিতে হইল ৫৬-এর দ্বিগুণ অর্থাৎ ১১২ ফুট। কিন্তু এই ১১২ যাইতে ঢেউয়ের কত সময় লাগে তোমরা বলিতে পার না কি? আগেই বলিয়াছি, ১১২০ ফিট পথ যাইতে শব্দের

ঢেউয়ের এক সেকেণ্ড সময় লাগে। কাজেই ১১২ ফিট যাইতে তাহার এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র সময় লাগিবে। তাহা হইলে দেখ এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগে যেই তোমার "ক" উচ্চারণ শেষ হইল, অমনি সেই সময়ে উহার ঢেউ দেওয়ালে ধাক্কা খাইয়া প্রতিধ্বনি শুনাইল। অর্থাৎ যেই উচ্চারণ শেষ করিলে, অমনি তাহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইলে।

মনে কর, তুমি যেন দেওয়াল হইতে সেই ৫৬ ফিট তফাতে থাকিয়াই "ক খ গ ঘ" এই চারিটি অক্ষর উচ্চারণ আরম্ভ করিলে। এখন প্রতিধ্বনির অবস্থা কি হইবে বলিতে পার কি? "ক" অক্ষর উচ্চারণ শেষ করিয়া তুমি যেই "খ" এর উচ্চারণ আরম্ভ করিবে, তেমনি "ক" এর প্রতিধ্বনি আসিয়া কানে প্রবেশ করিবে। এই রকমে "গ"এর উচ্চারণের সঙ্গে "খ" এর এবং "ঘ"এর উচ্চারণের সঙ্গে "গ" এর প্রতিধ্বনির মিল হইয়া যাইবে। ইহার ফল হইবে এই যে, তুমি "ক খ গ"এর প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইবে না। একের উচ্চারণ অপরের প্রতিধ্বনির সহিত মিশিয়া একটা গোলযোগের সৃষ্টি করিবে। দেওয়াল বা অন্য কোনো রকম বাধার খুব কাছে দাঁড়াইয়া প্রতিধ্বনি পরীক্ষা করার বিপদ্ এইখানে। ইহাতে প্রতিধ্বনি হয়, কিন্তু তাহা তোমারি মুখের শব্দের সহিত মিশিয়া গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে।

ইহা হইতে তোমার বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ, "ক খ"

ইত্যাদি খুব ছোটো শব্দের প্রতিধ্বনি শুনিতে হইলে দেওয়াল হইবে অন্ততঃ ছাপান্ন ফুট তফাতে দাঁড়ানো দরকার। কিন্তু যখন তোমরা কাহারো নাম ধরিয়া চীৎকার কর, তখন তাহাতে ছোটো শব্দ হয় না। কাজেই সমস্ত শব্দটা শেষ করিবার আগে তাহার প্রতিধ্বনি তোমার কানে আসিয়া পড়ে। ইহাতে প্রতিধ্বনি শুনা যায় না। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, আমরা সেকেণ্ডে পাঁচ মাত্রার চেয়ে বড় শব্দ উচ্চারণ করিতে পারি না। তাহা হইলে দেখ, এক মাত্রার উচ্চারণের জন্য এক সেকেণ্ডের পাঁচ ভাগের এক-ভাগ মাত্র সময় লাগে। কাজেই দেওয়াল হইবে ১১২ ফুট্ তফাতে না দাঁড়াইলে এক মাত্রার একটি শব্দের প্রতিধ্বনি শুনা যায় না। এই রকমে বলা যাইতে পারে, দুই মাত্রা শব্দের জন্য ২২৪ ফুট্, তিন মাত্রার জন্য ৩৩৬ ফুট ইত্যাদি দূরে দাঁড়ানো দরকার।

শব্দের ঢেউ প্রাচীর বা অন্য কিছুর গা হইতে ঠিক্‌রাইয়া একবার প্রতিধ্বনি করিল, ইহা প্রায়ই দেখা যায়। একই শব্দের দুই তিন বা চারিবার প্রতিধ্বনি হইতেছে, ইহা তোমরা দেখিয়াছ কি? আমরা কিন্তু ইহা অনেক দেখিয়াছি। মনে কর, সাম্‌না-সাম্‌নি দুইটা দেওয়াল দাঁড়াইয়া আছে। তুমি দুই দেওয়ালের মাঝে দাঁড়াইয়া একটা দেওয়ালের গায়ে যেন জোরে রবারের বল্ ছুঁড়িলে। এখন বল্‌টির অবস্থা কি হইবে? সেটি প্রথম দেওয়াল হইতে ঠিক্‌রাইয়া দ্বিতীয় দেওয়ালে ধাক্কা খাইবে, এবং সেখান হইতে ঠিক্‌রাইয়া আবার প্রথম দেওয়ালে

ধাক্কা পাইবে। একই শব্দের বহু প্রতিধ্বনি এই রকমেই হয়। মনে কর, ঐ রকম দুইটা দেওয়ালের মাঝে দাঁড়াইয়া তুমি যেন চীৎকার করিলে, এখন সেই শব্দের ঢেউ বার বার দুই দেওয়ালে ঠিক্‌রাইয়া অনেক প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করিবে না কি ?

একবার শব্দ করিলে পরে পরে তাহার পঁচিশ-ত্রিশটি প্রতিধ্বনি হয়, ইহাও অনেকে দেখিয়াছেন। ফ্রান্সের ভার্দুন্ সহরে দূরে দূরে দুইটা কেল্লা আছে। সেগুলির মাঝে দাঁড়াইয়া কোনো কথা বলিলে প্রায় বারো বার তাহার প্রতিধ্বনি শুনা যায়। ইটালির একটা পাহাড়ে ত্রিশ বার পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনি হয়। একবার মেঘ ডাকিলে তাহার গড়গড়ানি অনেক ক্ষণ ধরিয়া চলে। ইহাও প্রতিধ্বনির কাজ। মেঘ ডাকে একবার। সেই ডাকের ঢেউ যখন চারিপাশের মেঘে মেঘে ঠিক্‌রাইয়া কানে আনিয়া ঠেকে, তখনি আমরা মেঘের গড়গড়ানি শুনিতে পাই। আকাশের সব জায়গায় বাতাস একই অবস্থায় নাই। কোনো বাতাস গাঢ়, আবার কোনো বাতাস হাল্‌কা। কোনো বাতাসে বেশি জলীয় বাষ্প নাই, কোনো জায়গার বাতাসে আবার জলীয় বাষ্পই বেশি। তাই কখনো কখনো শব্দের ঢেউ বাতাসে ঠিক্‌রাইয়াও প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করে। সুতরাং মেঘের গড়গড়ানিকে কেবল মেঘ হইতে ঠিক্‌রাইয়া আসা প্রতিধ্বনি বলা যায় না। শব্দের ঢেউ বাতাসে ঠিক্‌রাইয়াও প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করে। আবার খাল বা বিলের স্থির জলে ঠেকিয়াও অনেক সময়ে প্রতিধ্বনির উৎপত্তি হয়।

তোমরা হয় ত ইহা লক্ষ্য করিয়াছ। নৌকায় করিয়া নদীতে বেড়াইবার সময়ে উঁচু গলায় কাহাকেও ডাকিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতিধ্বনি শুনা যায়। শব্দের ঢেউ জলে ঠিক্‌রাইয়া ইহার সৃষ্টি করে।

বালির কাজ ও চুণকাম শেষ হইলে যদি তোমরা নূতন পাকা ঘরের ভিতরে দাঁড়াইয়া চীৎকার কর, তবে ঘরের চারিদিক হইতে হো-হো নানা রকম শব্দ আসে এবং তাহাতে যেন ঘরটা গম্‌গম্‌ করিতে থাকে। ইহাও প্রতিধ্বনির আর একটা দৃষ্টান্ত। ঘরের দেওয়ালগুলি তোমার কাছ হইতে আট বা দশ ফিটের বেশি দূরে থাকে না। কাজেই তোমার চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে নানা দিক হইতে তাহার নানা প্রতিধ্বনি ফিরিয়া আসিয়া ভয়ানক গোলযোগের সৃষ্টি করে। যে-কোনো ফাঁকা ঘর বা গ্রামের যে-কোনো পোড়ো মন্দিরের ভিতরে চীৎকার করিলেও তোমরা এই রকম প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইবে। কিন্তু ঘরে টেবিল্ চেয়ার বাক্স পেটরা বা অন্য আস্‌বাব-পত্র সাজাইয়া রাখিলে আর সে-রকম প্রতিধ্বনি শুনা যাইবে না। কেন ইহা ঘটে, তোমরা হয় ত এখন নিজেরাই বলিতে পারিবে। জলে ঢিল ফেলিলে ঢেউ হয় এবং সেই ঢেউ পুকুরের কিনারায় বা ঘাটের পৈঠায় ঠিক্‌রাইয়া আবার জলের মাঝে চলিয়া আসে। এ কথা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। মনে কর, পুকুরের কিনারার জলে যেন কতকগুলা শুক্‌না কঞ্চি, গাছের ডাল বা আরো অনেক আবর্জ্জনা রহিয়াছে।

এই অবস্থায় জলের ঢেউয়ের দশা কি হইবে, ভাবিয়া দেখ। ঢেউগুলি কিনারায় ঠিক্‌রাইয়া ফিরিতে পারিবে কি? কখনই পারিবে না। জলে ডুবানো গাছের ডালে কঞ্চিতে এবং নানা আবর্জ্জনায় ঠেকিয়া ঢেউগুলি ভাঙিয়া যাইবে। সুতরাং ফিরিতে পারিবে না। যে-ঘরে চেয়ার টেবিল আলমারি প্রভৃতি সাজানো থাকে, সেখানে শব্দের ঢেউয়ের অবস্থা জলের ঢেউয়ের মতই হয়। তুমি কথা কহিলে বা চীৎকার করিলে যে-শব্দের ঢেউ জন্মে, তাহা এলোমেলো-ভাবে সাজানো আস্‌বাব-পত্রে ঠেকিয়া ভাঙিয়া যায়, কাজেই দেওয়ালে ঠিক্‌রাইয়া প্রতিধ্বনি উৎপন্ন করিতে পারে না।

একটা গল্পের কথা মনে পড়িল। অনেক দিন আগে, ইটালিতে একটা গির্জ্জা ছিল। পুরোহিত যখন উঁচু গলায় বক্তৃতা সুরু করিতেন, তখন তাঁহার গলার স্বরে গির্জ্জার প্রকাণ্ড ঘরটি গম্‌গম্ করিত। দশ হাত তফাতের লোকেও তখন তাঁহার কথা বুঝিতে পারিত না। কিন্তু বড়দিনের উৎসবে যখন গির্জ্জা লোকে ভরিয়া যাইত, তখন পুরোহিতের কথা সুন্দর শুনা যাইত। সাধারণ লোকে ভাবিত এই ব্যাপারটা ভগবানের লীলা। তাহা না হইলে বৎসরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে কেবল খৃষ্টের জন্মদিনে পুরোহিতের কথা শুনা যাইবে কেন? এই রকমে এই অদ্ভুত গির্জ্জার কথা এক সময়ে দেশ-বিদেশে রটিয়া গিয়াছিল এবং দলে দলে লোক আসিয়া গির্জ্জায় এই কাণ্ড দেখিত। তোমরাও বোধ হয়, এই গল্প শুনিয়া

অবাক্ হইতেছ। কিন্তু ইহাতে অবাক্ হইবার বিশেষ কিছু নাই। আস্‌বাব-পত্র না থাকিলে সামান্য শব্দে ঘর গম্‌গম্ করে, তাহা তোমরা জানো। ঐ গির্জ্জায় কয়েকখানা বেঞ্চ ছাড়া আর কোনো আস্‌বাব ছিল না, তাই প্রতিধ্বনিতে ঘর গম্‌গম্ করিত। কিন্তু বড়দিনে যখন লতায় পাতায় ফুলে ও নিশানে তাহার সমস্ত দেওয়াল ঢাকা পড়িত, এবং ঘরটি লোকে ভরিয়া উঠিত, তখন শব্দের ঢেউ আর আগের মতো দেওয়ালে ঠিক্‌রাইয়া প্রতিধ্বনি করিতে পারিত না। তাই এই দিনে পুরোহিতের কথা স্পষ্ট শুনা যাইত। মজার ব্যাপার নয় কি ?

কলিকাতার সিনেট হাউসের ভিতরে বোধ করি তোমরা সকলে যাও নাই। প্রকাণ্ড ঘর। যাঁহারা বি, এ, এবং এম, এ, প্রভৃতি পরীক্ষা পাশ করেন, তাঁহাদের সকলকে ডাকিয়া এই ঘরে উপাধি দেওয়া হয়। সে-সময়ে অনেক গণ্য-মান্য লোকও উপস্থিত থাকেন। তাঁহারা বক্তৃতা করেন ও উপদেশ দেন। ঐ ইটালির গির্জ্জার মতো সিনেট ঘরেরও একটা ভয়ানক দোষ ছিল। এক ধারে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা সুরু করিলে ঘরটা প্রতিধ্বনিতে গম্‌গম্ করিত, ইহাতে অন্য ধারের লোকে কথা স্পষ্ট শুনিতে পাইত না। সে দোষ আর নাই। এখন বক্তার আসনের পিছন দিকে একটা প্রকাণ্ড ন্যুব্জ-পৃষ্ঠ ঢাল খাড়া করা হইয়াছে। বক্তৃতার ঢেউ সেই ঢালে ঠিক্‌রাইয়া সম্মুখের সোজা পথে ছুটিয়া চলে। এখন আর সে-রকম প্রতিধ্বনি হয় না।

ইংলণ্ডের সেণ্ট পল্ গির্জ্জার নাম বোধ করি তোমরা শুনিয়াছ। ইহা অতি পুরাতন গির্জ্জা। ইহার মাথায় একটা গম্বুজ আছে। গম্বুজের নীচে বসিয়া ফিশ্‌ফাশ করিয়া কথা বলিলেও তাহা সকলের কানে যায়। কেন ইহা হয়, তোমরা বোধ হয় তাহা বুঝিতে পারিয়াছ। শব্দের ঢেউ গম্বুজে ঠিক্‌রাইয়া প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করে।

খুব উত্তর ও দক্ষিণের দেশ ভয়ানক ঠাণ্ডা। শীতকালে সে সব দেশের নদী-সমুদ্রের জল জমিয়া বরফ হয়। আবার একটু গরম পড়িলে সেই বরফের কিছু কিছু গলিতে আরম্ভ করে। এই সময়ে ঐ সকল দেশের সমুদ্রে জাহাজ চালাইতে গেলে প্রায়ই বিপদে পড়িতে হয়। পাহাড়ের মতো বড় বড় বরফের স্তূপ সর্ব্বদা জলে ভাসিয়া বেড়ায়। আবার মাঝে মাঝে এমন কুয়াসা হয় যে, কাছের জিনিষকেও দেখা যায় না। ইহাতে বরফের পাহাড়ে ধাক্কা পাইয়া অনেক জাহাজ ডুবিয়া যায়। এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য জাহাজের মাল্লারা সর্ব্বদাই একটা বাঁশী বাজায়। সম্মুখে বরফের বড় স্তূপ থাকিলে বাঁশীর শব্দ তাহাতে ধাক্কা খাইয়া প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করে। মাল্লারা তাহা শুনিয়া সাবধান হয়। তাহা হইলে দেখ, প্রতিধ্বনি দ্বারা আমাদের অনেক কাজও হয়।

তোমরা আগেই শুনিয়াছ, শব্দের ঢেউ মণ্ডলাকারে যত দূরে যায়, ততই তাহা অধিক পরিমাণ বাতাসকে কাঁপায়। ইহাতে

শব্দের জোর-আওয়াজ ক্রমে কমিয়া আসে। তাই খুব জোরালো শব্দকেও অনেক দূর হইতে শুনা যায় না। এখন যদি শব্দের ঢেউকে চারিদিকে ছড়াইতে না দিয়া কোনো উপায়ে এক দিক্ লক্ষ্য করিয়া চালানো যায়, তাহা হইলে কি হয় ভাবিয়া দেখ। ধনুক হইতে তীর ছুড়িলে তাহা যেমন এক দিক্ লক্ষ্য করিয়া ছুটে, তখন শব্দের ঢেউ কতকটা যেন সেই রকমেই ছুটিয়া চলে। তখন তাহাকে আর আশ-পাশের বা উপর-নীচের বাতাসকে কাঁপাইতে হয় না। ইহার ফলে শব্দের ঢেউ অনেক দূর পর্যন্ত চলিয়া যায়। বন্দুক হইতে গুলি-ছোড়া ধনুক হাতে তীর-ছোড়ার মতো, কয়েক রকম যন্ত্র দিয়া শব্দ-ছোড়ারও রীতি আছে।

মনে কর, যেন একটা লোক খোলা মাঠে আধ্ মাইল তফাৎ দিয়া যাইতেছে। লোকটাকে দেখা যাইতেছে না এবং খুব চীৎকার করাতেও তাহার কানে শব্দ পৌঁছিতেছে না। এখন যদি তুমি হাতকে মুঠা করিয়া একটা নলের মতো করিতে পার এবং মুঠার ফাঁকে মুখ রাখিয়া চীৎকার করিতে পার, তাহা হইলে দেখিবে তোমার চীৎকারের শব্দ সেই দূরের লোকটির কানে পৌঁছিতেছে। কেন এমন হয় বলিতে পার কি? মুঠার ভিতরে শব্দ করাতে তাহার ঢেউ মুঠার নলে বাধা পায়। কাজেই তাহা এক দিক্ লক্ষ্য করিয়া লোকটির কানে পৌঁছায়। মজার ব্যাপার নয় কি?

এখানে একটা যন্ত্রের ছবি দিলাম। যন্ত্রটি টিনের বা অন্য

কোনো ধাতুর একটা শানাইয়ের মতো লম্বা নল ছাড়া আর কিছুই নয়। ইহার গোড়ার ফাঁকের চেয়ে আগার ফাঁক বেশি। এই রকম নলের গোড়ায় মুখ রাখিয়া চীৎকার করিলে তাহার শব্দ অনেক দূর যায়। এই রকম কুড়ি ফুট লম্বা নলে শব্দ করিলে তাহা তিন মাইল পর্য্যন্ত যাইতে পারে।

পুলিশের লোকে ও সিপাহীরা যে বিগিল্ বাজায় তাহার শব্দও অনেক দূর যায়। আমরা একবার চারি মাইল তফাৎ হইতে বিগিলের শব্দ শুনিয়াছিলাম। শানাইয়ের শব্দ অনেক দূর যায়। মাঠের ওপারে এক ক্রোশ দূরে পূজা-বাড়ীতে শানাই বাজিতেছে, তাহারি শব্দ আমরা গ্রামে বসিয়া শুনিয়াছি।

ইহার কারণ এখন তোমরা নিজেরাই বলিতে পারিবে। শানাই ও বিগিল্ নলের মতো যন্ত্র। তাই শব্দের ঢেউ নলের ভিতর হইতে বাহির হইয়া সোজা পথে অনেক দূর চলিতে পারে। দশহরা বা প্রতিমা-বিসর্জ্জনের দিনে তোমরা কখনো নদীতে নৌকা করিয়া বেড়াইয়াছ কি? অনেক দূরের শানাই ও ঢাক-ঢোলের শব্দ তখন বেশ স্পষ্ট শুনা যায়। ইহার কারণ কিন্তু স্বতন্ত্র। নদীর উপরকার বাতাস সন্ধ্যার সময়ে বেশ শান্ত থাকে। তা ছাড়া ডাঙার বাতাস যেমন কোথাও হাল্‌কা এবং কোথাও গাঢ় হয়, জলের উপরকার বাতাস প্রায়ই সে-রকম

হয় না। এই জন্যই স্থির ও সম-ঘন বাতাসের ভিতর দিয়া শব্দের ঢেউ পূরামাত্রায় চলিয়া আসে।

ডাক্তার বাবু রোগী দেখিতে আসিয়া পকেট হইতে একটা নলের মতো যন্ত্র বাহির করেন। এই নলে শানাইয়ের মতো একটা মুখ লাগানো থাকে। সেই মুখ রোগীর বুকে-পিঠে

লাগাইয়া ডাক্তার বাবু রোগ ঠিক্ করে। এই যন্ত্রের নাম ষ্টেথোস্কোপ্। নামটি বিশ্রী কিন্তু জিনিষটি বড় মজার। রোগীর শরীরের ভিতরকার ফুস্‌ফুসে ও হৃদ্‌পিণ্ডে যে-সকল শব্দ হয়, তাহা বাহির হইতে শোনা যায় না এবং রোগীও তাহা বুঝিতে পারে না। কিন্তু ডাক্তার বাবু যখন বুকে পিঠে যন্ত্র লাগাইয়া তাহার নল কানে ধরেন, তখন ভিতরকার ছোটোখাটো সকল শব্দেরই ঢেউ নলের ভিতর দিয়া কানে আসিয়া ঠেকে। ফুস্‌ফুস্ ও হৃদপিণ্ড প্রভৃতিতে কোনো রোগ হইয়াছে কিনা, ইহা হইতে ডাক্তার বাবু বুঝিতে পারেন।

যাহারা কানে অল্প শুনে, ভালো করিয়া শুনিবার জন্য তাহাদিগকে এক রকম যন্ত্র ব্যবহার করিতে দেখা যায়। ইহা হয় ত তোমরা সকলে দেখ নাই। পর পৃষ্ঠার ছবিতে দেখ, ইহাও এক রকম নলের মতো যন্ত্র। কালারা এই যন্ত্রের সরু দিক্‌টা কানে লাগাইয়া বসিয়া থাকে। বাহিরের শব্দের ঢেউ প্রথমে ঐ বাটির মতো চওড়া অংশে আসিয়া ঠেকে এবং তা'র

পরে নলের ভিতরে বার বার ঠিকরাইয়া কানে প্রবেশ করে। এই ব্যবস্থায় শব্দের ঢেউ চারিদিকে ছড়াইয়া দুর্ব্বল হইতে পারে না। কাজেই যাহারা স্বভাবত কম শুনে, তাহারা নলের ভিতরকার প্রবল ঢেউয়ে বেশ ভালো শুনিতে পার।

গরু ঘোড়া ছাগল গাধা খরগোস কুকুর প্রভৃতি অনেক জন্তুরই বাহিরের কানটা প্রকাণ্ড লম্বা। কেবল তাহাই নয়, সেগুলির মাঝটা আবার পেয়ালার মতো খোল। নিজের কানে হাত দিয়া দেখ, বুঝিবে ইহাঁরো আকৃতি যেন পেয়ালা বা তেল ঢালা ফনেলের মতো।

কানের আকৃতি এই রকম কেন হয়, তোমরা বোধ হয় তা বুঝিতে পারিয়াছ। এই কানগুলি যেন শব্দ ধরার এক একটা ফাঁদ। কানের খোলে শব্দের ঢেউ জমা হয়। তা'র পরে তাহাই কানের ছিদ্রে গিয়া বার বার ঠিক্‌রাইয়া বেশ জোরালো হইয়া পড়ে। ইহাতে খুব ছোটো আওয়াজও বেশ ভালো শুনা যায়।

আমরা কান নাড়াইতে পারি না। কিন্তু গরু কুকুর খরগোস প্রভৃতি জন্তুরা তাহাদের লম্বা কানগুলিকে বাঁয়ে ডাইনে যে-

দিকে খুসী হেলাইতে পারে। তোমরা ইহা দেখ নাই কি ? এই সব জন্তু এই রকমে কান নড়াইয়া কোন্ দিক্ হইতে শব্দ আসিতেছে তাহা বুঝিয়া লয় এবং শব্দের ঢেউগুলিকে ধরিয়া কানে পুরিতে থাকে। লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, আমাদের পোষা কুকুরটি সর্ব্বদাই এ-পাশে ও-পাশে কান নাড়ায় এবং একটু শব্দ হইলে ঠিক সেইদিকে কান্‌টিকে বাঁকাইয়া শব্দ ভালো করিয়া শব্দ শুনিয়া লয়। তার পরে ভেউ ভেউ করিয়া চীৎকার সুরু করে। তোমাদের পোষা কুকুরটিকেও ঠিক্ এই রকমেই কান নাড়াইতে দেখিবে। তাহা হইলে বুঝা গেল, আমাদের বাহিরের কান নিতান্ত অনাবশ্যক জিনিষ নয়। কান কাটিয়া দিলে বড় মুস্কিল হয়। কান-কাটা মানুষ আমরা দেখি নাই। তোমরা দেখিয়াছ কি ? যদি কখনো কান-কাটা লোকের সঙ্গে দেখা হয়, তবে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবে, সে কানে নিশ্চয়ই কম শুনে কান-কাটা কুকুর গ্রামে ও পাড়ায় প্রায়ই দুই একটা দেখা যায়। ইহারাও বোধ করি অন্য কুকুরদের চেয়ে কম শুনে।

শব্দের ঢেউ কত লম্বা

শব্দের ঢেউয়ের সঙ্গে আমরা অনেক বার জলের ঢেউয়ের তুলনা করিয়াছি। জলের ও শব্দের ঢেউয়ের প্রকৃতিতে কিছু মিল থাকিলেও আকৃতিতে কিন্তু একেবারে মিল নাই। জলের ঢেউ চলে জলকে উঁচু-নীচু করিতে করিতে; শব্দের ঢেউ চলে বাতাসকে সংকুচিত ও প্রসারিত করিতে করিতে।

পর-পৃষ্ঠায় জলের ঢেউয়ের একটা ছবি দিলাম। দেখ, জল উঁচু-নীচু হইয়া ঢেউয়ের সৃষ্টি করিতেছে। তা'র পর-পৃষ্ঠায় শব্দের ঢেউ আঁকা আছে। তাহাতে দেখ, ঢেউ বাতাসকে একবার সংকুচিত এবং একবার প্রসারিত করিয়া ছুটিতেছে।

বিকাল বেলার ঝির-ঝিরে বাতাসে পুকুরের জলে যে-ঢেউ উঠে, তাহা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। এই ঢেউ জলের উপর-টাকে সামান্য উঁচু-নীচু করে এবং খুব কাছাকাছি থাকিয়া ছুটিয়া চলে। ইহা দৈর্ঘ্যে ও উঁচুতে অল্প। একটু বেশি বাতাস উঠিলে পদ্মা ও মেঘনা নদীতে যে ঢেউ উঠে তাহা বোধ করি তোমরা দেখ নাই। তখন জল ছয়-সাত হাত উঁচু হইয়া ঢেউয়ের সৃষ্টি করে; দৈর্ঘ্যেও এগুলি খুব বড় হয়। দূরের জেলে ডিঙিগুলি যখন ঢেউয়ের খোলের মধ্যে পড়ে, তখন

তাহাদের দেখাই যায় না। তাহা হইলে দেখ, জলের ঢেউ সকল সময়ে সমান চওড়া থাকে না। ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য কাহাকে বলিতেছি, তাহা বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পার নাই।

ঢেউয়ের দুইটা অংশ থাকে। একটা থাকে মাথা, এবং আর একটা থাকে খোল। ঢেউয়ের জল যখন উঁচু হইয়া দাঁড়ায়, তখন সেই উঁচু জলের চূড়াকেই বলিতেছি মাথা এবং ঢেউয়ের জল যখন নীচুতে নামে তখন তাহার গর্ত্তকেই বলিতেছি খোল। কোনো ঢেউয়ের এক মাথা হইতে ঠিক্ পরের মাথা পর্য্যন্ত বা এক খোল হইতে পরের খোল পর্য্যন্ত যে মাপ তাহাকেই বলা হয় ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য।

জলের ঢেউয়ের মতো শব্দের ঢেউ মাপিবারও রীতি আছে। তোমাদের আগেই বলিয়াছি, জলের ঢেউ যেমন উঁচু-নীচু হইয়া চলে, শব্দের ঢেউ বাতাসকে সে রকমে উঁচু-নীচু করিয়া চলে না। শব্দের ঢেউ চলে বাতাসকে সংকুচিত ও প্রসারিত করিয়া। সুতরাং বলা যায়, মাথা ও কোল লইয়া যেমন জলের ঢেউয়ের উৎপত্তি, সেই রকম সংকোচন ও প্রসারণ লইয়া শব্দের ঢেউয়ের সৃষ্টি। তাই শব্দের ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য ঠিক্ করার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা এক সংকুচিত অংশ হইতে পরের সংকুচিত অংশ বা এক প্রসারিত অংশ হইতে অন্য প্রসারিত অংশ মাপিয়া থাকেন এবং তাহাকেই বলেন, ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য।

শব্দের এক-একটা ঢেউ কত লম্বা হয়, তাহাই তোমাদিগকে বলিব। জলের ঢেউ চোখে দেখা যায়; তাহার যে দৈর্ঘ্য
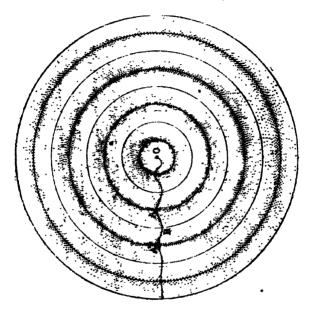
আছে তাহাও বুঝা যায়। বাতাস চোখে দেখা যায় না কাজেই শব্দের ঢেউয়ের আকৃতি চোখে দেখিয়া জানা যায় না। কিন্তু হিসাবে ধরা পড়ে।

একটা উদাহরণ লওয়া যাউক। মনে কর, সেতার এস্‌রাজ তানপুরা বা একতারা প্রভৃতি যে কোনো যন্ত্রের একটি তারকে আঙুল দিয়া টানিয়া কাঁপানো গেল। যতবার তার কাঁপিতে লাগিল, ঠিক ততগুলিই ঢেউ উৎপন্ন হইয়া বাতাসের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিল। কত বেগে চলিতে লাগিল? সেকেণ্ডে

১১০০ বা ১১২০ ফিট বেগে চলিল। কিন্তু তারটি সেকেণ্ডে কতবার কাঁপিতেছে তোমরা বলিতে পার কি? চোখে দেখিয়া হঠাৎ বলা যায় না। উহা সেকেণ্ডে দশ বার কাঁপিতে পারে, আবার পাঁচ শত বা হাজার বারও কাঁপিতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক কাঁপুনিতে এক-একটা ঢেউ হয় এবং তাহা সেকেণ্ডে ১১০০ ফুট বেগে চলে। অর্থাৎ এক মাইল পথ যাইতে শব্দের ঢেউ পাঁচ সেকেণ্ডের বেশি সময় লয় না।

এখন মনে কর তোমাদের তানপুরা বা একতারার তারটি যেন সেকেণ্ডে দশ বার কাঁপিতেছে। কাজেই বলিতে হয়, তাহা হইতে সেকেণ্ডে দশটা ঢেউ বাহির হইতেছে। আগে প্রথম ঢেউ, তার পিছনে দ্বিতীয় ঢেউ, তার পিছনে তৃতীয় ঢেউ। এই রকমে একের পর অন্য একটি থাকিয়া দশটি ঢেউ সারি বাঁধিয়া চলিতে থাকিল।

কিন্তু শব্দের ঢেউ চলে সেকেণ্ডে ১১০০ ফিট্ বেগে। তাহা হইতে দেখ, এক সেকেণ্ডের শেষে যখন দশটা ঢেউ বাহির হইয়া গেল, তখন প্রথম ঢেউটা গিয়াছে ১১০০ ফিট্ দূরে, আর বাকি নয়টি রহিয়াছে তাহারি পিছনে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া। কাজেই বলিতে হয়, একের পিছনে আর একটি দাঁড়াইয়া এই দশটা ঢেউয়ে ১১০০ ফিট্ জায়গাটি জুড়িয়া আছে। একের পিছনে আর একজন দাঁড়াইয়া আমরা ড্রিল করি। মনে কর, তোমরা ড্রিলের সময়ে দশ জনে যেন কুড়ি ফুট লাইনে একের পর আর একজন দাঁড়াইয়াছে। দশ জনে যদি কুড়ি ফুট্ জায়গা জুড়িয়া

থাকে, তবে এক-এক জনে কতটা জায়গা জুড়িয়া আছে তোমরা বলিতে পার না কি? দশ দুগুণে কুড়ি,—অতএব তোমাদের প্রত্যেকে দুই ফুট্ জায়গা জুড়িয়া আছ। এখানে সেই রকম দশটা ঢেউয়ে ১১০০ ফুট্ জায়গা জুড়িয়া আছে। কাজেই এক-একটা শব্দের ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য ১১০ ফুট্।

আর একটা উদাহরণ লও। মনে করা যাউক, যন্ত্রের তার যেন সেকেণ্ডে এক শত বার কাঁপিতেছে। অর্থাৎ আগের উদাহরণের মতো এক সেকেণ্ডের শেষে ১১০০ ফুট জায়গাতে যেন এক শত ঢেউ সারি দিয়া দাঁড়াইল। তাহা হইলে এক-একটা ঢেউ কতটা জায়গা জুড়িয়া রহিল, বলা যায় না কি? ১১০০ ফুটকে এক শত দিয়া ভাগ করিলে ১১ ফুট হয়। অতএব এখানে এক-একটি ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য ১১ ফুট।

ইহা হইতে কি বুঝা গেল? বুঝা গেল যে, তার প্রতি সেকেণ্ডে যত বার কাঁপে শব্দের ঢেউ ঠিক্ ততগুলি উৎপন্ন হয়। দেখা গেল, শব্দের ঢেউ প্রতি সেকেণ্ডে যত দূর যায়, সেই সংখ্যাকে কাঁপুনির সংখ্যা দিয়া ভাগ দিলে ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য জানা যায়। ইহা হইতে আরো জানা গেল, কাঁপুনি যত ঘন ঘন হয়, ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য তত ছোটো হয়।

তারের কাঁপুনি

কোনো তার তাড়াতাড়ি কাঁপে এবং কোনো তার ধীরে কাঁপে। কেন ইহা ঘটে, তোমাদিগকে তাহা বলা হয় নাই।

তারের কাঁপুনি তাহার দৈর্ঘ্যের উপরে নির্ভর করে। মনে কর, একটা তার সেকেণ্ডে দশ বার কাঁপিতেছে। এখন যদি তোমরা তার গাছটিকে অর্দ্ধেক কর, তবে দেখিবে ইহা সেকেণ্ডে কুড়ি বার করিয়া কাঁপিতেছে। তার যত ছোটো হয়, তাহার কাঁপুনির সংখ্যা সেই অনুপাতে বাড়িয়া চলে। অর্থাৎ তারকে অর্দ্ধেক করিলে কাঁপুনি দ্বিগুণ হয় হয়, তিন ভাগের এক-ভাগ করিয়ে তিন গুণ হয়, চারি ভাগের এক-ভাগ করিয়ে চারি গুণ হয়।

আবার তার যত সরু করা যায়, তাহার কাঁপুনি ততই বাড়ে। মনে কর, একই রকম লম্বা দুইটা তার আছে এবং দুইটাকে যেন একই জোরে টানিয়া রাখা গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে যদি একটা অন্যের চেয়ে দ্বিগুণ মোটা হয়,—তবে সরু তার যত বার কাঁপিতেছে, মোটা তার তাহার অর্দ্ধেক বার কাঁপিবে।

কেবল ইহাই নয়, টানের সঙ্গেও কাঁপুনির বিশেষ সম্বন্ধ আছে। অর্থাৎ তারকে যত জোরে টানিয়া বাঁধা যায়, তাহার কাঁপুনিও তত বেশি হইতে থাকে। মনে কর, একই রকম লম্বা এবং একই রকম মোটা দুইটি লোহার 'তারের মধ্যে একটাকে

অন্যটার চারি গুণ জোরে টানিয়া বাঁধা গেল। এখন পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, আল্‌গা তারটি সেকেণ্ডে যতবার কাঁপিতেছে, অন্য তারটি তাহারি দ্বিগুণ বার কাঁপিতেছে। এই রকমে দেখা যায়, টান নয় গুণ বেশী করিলে কাঁপুনি তিন গুণ বাড়ে, ষোল গুণ করিলে চারি গুণ বাড়ে।

তাহা হইলে দেখ, তারের কাঁপুনি কেবল একটা জিনিষের উপরে নির্ভর করে না। তার যত ছোট হয়, তাহার কাঁপুনি ততই বাড়ে; তার যত সরু হয়, তাহার কাঁপুনি ততই বাড়ে এবং তারকে যত টানিয়া বাঁধা যায়, তাহার কাঁপুনি ততই বাড়িয়া চলে।

শব্দ-ভাণ্ড

সব শব্দ সমান নয়। কোনো শব্দ মৃদু, অর্থাৎ মিন্‌মিনে,—এগুলিকে দূর হইতে শুনা যায় না। আবার কোনো শব্দ প্রবল অর্থাৎ জোরালো,—এগুলিকে অনেক দূর হইতে শুনা যায়। শব্দ কেন মৃদু ও প্রবল হয়, সে-সম্বন্ধে অনেক কথা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। তখন বলিয়াছিলাম, কোনো আবরণে বাতাস আবদ্ধ রাখিয়া তাহারি কাছে যদি মৃদু শব্দের ঢেউ উৎপন্ন করা যায়, তবে আবরণ এবং তাহার ভিতরকার বাতাস কাঁপিয়া শব্দকে জোরালো করে। তানপুরা সেতার বীণা এবং এস্‌রাজের তুম্বীর ভিতরে বাতাস ভরা থাকে। তারের মৃদু কাঁপুনিতে তুম্বা ও তাহার ভিতরকার বাতাস কাঁপিয়া জোরালো শব্দের ঢেউ উৎপন্ন করে। ঢাক ঢোল বাঁওয়া তবলা এবং মৃদঙ্গেতেও তাহাই দেখা যায়। তানপুরা সেতার ও এস্‌রাজের তুম্বীকে এবং ঢাক ঢোল বাঁওয়া তবলা ও মৃদঙ্গের খোলকেই শব্দ-ভাণ্ড বলিতেছি। হারমোনিয়াম্ ও পিয়ানোর বাক্সই তাহাদের শব্দ-ভাণ্ড। এই সকল যন্ত্রে যদি শব্দ-ভাণ্ড না থাকে, তবে যন্ত্র বৃথা হয়। হাজার বাজাইলেও সেগুলি হইতে জোরালো শব্দ বাহির হয় না। তুম্বীটাকে ভাঙ্গিয়া দিয়া যদি একটা সেতার বা তানপুরা বাজাইতে চেষ্টা করা যায়, তবে খুব বড় ওস্তাদও তাহা হইতে জোরালো সুর বাহির করিতে

পারিবেন না। ঢাকের খোলটাকে তফাতে রাখিয়া খুব পাকা ঢাকী যদি ঢাকের কেবল চামড়াকেই বাজাইতে আরম্ভ করে, তবে সে বাজনা দু'হাত তফাতেও শুনা যাইবে না। এক-একটা বেহালার দাম কত বেশি হইতে পারে, বোধ করি তাহা তোমরা জানো না। পাঁচসিকা দামের বেহালা মেলার সময়ে অনেক কিনিতে পাওয়া যায়। আবার দু'হাজার দশ-হাজার টাকা দামেরও বেহালা অনেক আছে। তারের কাঁপুনিতে যে-বেহালার খোলের কাঠ ও তাহার ভিতরকার বাতাস ঠিক্ মতো কাঁপিয়া মধুর সুরের প্রবল ঢেউ তুলিতে পারে, সেই বেহালারই দাম বেশি।

প্রত্যেক জিনিষই এক-একটা বাঁধাবাঁধি নিয়মে এবং একটা ধরা-বাঁধা সময়ে কাঁপিতে পারে। তোমরা বোধ হয় এই কথাটি বুঝিলে না। মনে কর, তোমরা সকলে মিলিয়া গাছের ডালে দড়ি বাঁধিয়া দুইটা দোল্‌না তৈয়ারি করিলে। একটা দোল্‌নার দড়ি হইল যেন চারি হাত লম্বা এবং আর একটার দড়ি যেন ষোল হাত লম্বা। এখন তোমাদের দু'জনে দুই দোলনায় চাপিয়া যদি দোল খাইতে আরম্ভ কর, তবে দেখিবে দোলনা দুইটি একই ভাবে দুলিতেছে না। যাহার দড়ি খাটো, তাহা তাড়াতাড়ি দুলিবে এবং যাহার দড়ি লম্বা তাহা ধীরে ধীরে দুলিয়া আসিবে। অর্থাৎ খাটো দড়ির দোল্‌না যদি একবার দুলিতে দুই সেকেণ্ড লয়, তবে দেখিবে বড় দড়ির দোল্‌না একবার দুলিয়া আসিতে হয় ত চারি সেকেণ্ড সময় লইতেছে। ইহা বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার। ছোটো দোল্‌নাকে তোমরা কোনো প্রকারে ধীরে দোলাইতে

পারিবে না এবং বড় দোলনাকেও কখনো তাড়াতাড়ি দোলাইত পারিবে না।

আমরা দোল্‌না লইয়া উদাহরণ দিলাম, কিন্তু কেবল দোল্‌নাতেই যে ইহা খাটে তাহা নয়। যে-জিনিষ দোলে, যে-জিনিষ কাঁপে, তাহাদের সকলেরি দুলুনি ও কাঁপুনি এক-একটা নির্দ্দিষ্ট সময়েই হয়। মনে কর, জোরে ঘা মারিয়া একটা কাঁসার বাটিকে কাঁপানো গেল। যদি লক্ষ্য কর তবে দেখিবে, কাঁপাইলে বাটিটা সকল সময়েই ঠিক্ এক রকম ভাবেই কাঁপে। তাই যখন কাঁপানো যায়, তখন তাহা হইতে একই সুর বাহির হয়। লোহার মোটা তার বা দড়ি টাঙাইয়া তাহার উপরে অনেকে অনেক রকম খেলা দেখায়। তার দোলে এবং খেলোয়াড়েরা সেই তারের উপরে দাঁড়াইয়া কস্‌রৎ দেখায়। নজর রাখিলে দেখিবে, ইহারো দুলিবার একটা নিয়ম আছে। নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যতীত তাহা দোলে না। তাই তারের উপরে দাঁড়াইয়া তাহার কাঁপুনির তালে তালে ঝোঁক দিলে সেটি উপরে উঠিয়া ও নীচে নামিয়া দুলিতে থাকে।

কাঁসার বাটি দোল্‌না ও তারের সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, কোনো পাত্রে বা কোনো আবরণের মধ্যে খানিকটা বাতাস আট্‌কানো থাকিলে, তাহারো সম্বন্ধে ঠিক্ সেই কথাই বলা যায়। এই রকমে আবদ্ধ বাতাসের ও তাহার আবরণের কাঁপিবারও একটা রীতি আছে। তাহাও দোল্‌না বা তারের মতো এক একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে কাঁপুনি শেষ করে। পর-পৃষ্ঠায় একটি

ছবি দিলাম। দেখ, বেহালার ছড় টানিয়া একটা কাঁসার বাটিকে কাঁপানো হইতেছে। তার পরে দেখ, একটা শূন্য পাত্র সেই বাটির কাছে ধরা হইয়াছে। পাত্রে বাতাস ভরা আছে। কিন্তু এই বাতাসটুকু এই রকম যে, তাহা বাটির কাঁপুনির সঙ্গে তাল রাখিয়া কাঁপিতে পারে। এখন বাটিকে বাজাইলে পাত্রের বাতাসের

অবস্থা কি হইবে তোমরা বলিতে পার কি? বাটির কাঁপুনির সঙ্গে পাত্রের ভিতরকার বাতাসের কাঁপুনির মিল আছে। কাজেই বাটি হইতে যে-শব্দের ঢেউ বাহির হইল, তাহা পাত্রের বাতাসকে কাঁপাইয়া খুব জোরালো ঢেউ উৎপন্ন করিতে থাকিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে বাটির মিন্‌মিনে শব্দ খুব জোরালো হইয়া পড়িবে। তোমরা ইহা দেখ নাই কি? আমরা এই রকম ঘটনা অনেক দেখিয়াছি।

মনে কর, তোমাদের বাড়ীতে যে একটি ছোটো খালি কুঠারি আছে, তাহাতে গিয়া তোমরা চারি পাঁচ জনে মিলিয়া একে একে "হো-হা" শব্দে চীৎকার করিতে লাগিলে। তুমি চীৎকার করিলে মিহি সুরে, আর একজন চীৎকার করিল একটু

মোটা সুরে এবং আমি চীৎকার করিলাম খুব মোটা গলায়। এই রকম-বেরকম সুরে শব্দ করিলে দেখিবে, সেগুলির মধ্যে একটা সুর যেন খুব প্রবল হইয়া উঠিতেছে। একটা ছোটো ঘটনার কথা বলি। আমাদের স্নানের ঘরটি নিতান্ত ছোটো। তাহাতে দুটা মানুষও বোধ করি শুইতে পারে না। প্রতিদিনই বেলা বারোটার সময়ে আমাদের বাড়ীর চারিদিকের আট-দশটা ধান-কলের বাঁশি বাজিয়া উঠে। কোনো বাঁশির আওয়াজ উঁচু; কোনো বাঁশির আওয়াজ নীচু; কোনো বাঁশির আওয়াজ মিষ্ট; কোনো বাঁশির আওয়াজ কর্কশ। এই সময়ে স্নানের ঘরে গিয়া দেখিয়াছি, পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিক হইতে যে একটা বাঁশি বাজে তাহার শব্দে যেন ঘরটা ভরিয়া উঠে এবং গম্‌গম্‌ করিতে থাকে। কেন এমন হয়, বোধ করি তোমরা এখন নিজেরা বলিতে পারিবে। স্নানের ঘরের আবদ্ধ বাতাসের কাঁপুনির সঙ্গে কলের বাঁশির শব্দের ঢেউয়ের মিল আছে, তাই বাঁশির শব্দের কাঁপুনি স্নানের ঘরের বাতাসকে কাঁপাইতে পারে। এইজন্যই ঘরের বাতাস আট-দশ রকম শব্দের মধ্যে সেই একটা বাঁশির আওয়াজে সাড়া দেয়।

আর একটা উদাহরণের কথা বলি। এক মুখ বন্ধ বড় ফাঁকওয়ালা একটা কাচের চোঙ লও। তেল বা দুধ মাখিবার বাঁশের চোঙাতেও চলিতে পারে। চোঙটি খালি আছে। এখন গাড়ুর নল দিয়া অতি ধীরে তাহাতে জল ঢালিতে থাক, এবং সঙ্গে সঙ্গে কাছেই একটা হুইসিল্ বাজাও। দেখিবে, চোঙের

একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ পর্য্যন্ত জলে ভর্ত্তি হইলে, হুইসিলের শব্দ খুব জোরালো হইয়া পড়িবে। কেন এমন হইল? চোঙ বাতাসে ভর্ত্তি ছিল। কিন্তু ঐ বাতাসের কাঁপুনির সহিত হুইসিল্ হইতে যে শব্দের ঢেউ উঠিতেছে তাহার মিল ছিল না। তা'র পরে জল ঢালিয়া চোঙের বাতাসকে কমাইতে থাকিলে তাহা এমন একটা অবস্থায় আসিল, যখন হুইসিলের শব্দের ঢেউয়ের মতো তাহা কাঁপিতে লাগিল। কাজেই তখন হুইসিলের শব্দ জোরালো হইল।

এখানে আর একটা ছবি দিলাম। দেখ, হুইসিলের বদলে একটা বাঁকানো ইস্পাতে ঘা মারিয়া শব্দ করা হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা কাচের চোঙে জল ঢালা চলিতেছে। প্রথমে এই শব্দে চোঙের বাতাস সাড়া দিবে না। তার পরে জল ঢালার সঙ্গে বাতাস কমিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট সীমায় আসিলে, সেই মৃদু শব্দই জোরালো হইয়া পড়িবে। ইহার পরেও যদি জল ঢালিতে থাকো, তাহা হইলে দেখিবে, শব্দের জোর কমিয়া আবার আগেকার মতো
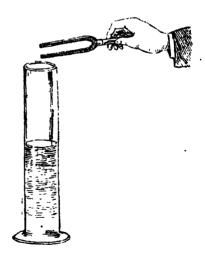
হইতেছে। বাতাস বেশি কমিল, তাই তাহার কাঁপুনির সহিত শব্দের ঢেউয়ের কাঁপুনির মিল থাকিল না। ইহাতে সাড়া দেওয়া বন্ধ হইল।

তানপুরা ও সেতারের তুম্বী, এবং ঢাক ও মৃদঙ্গের খোল, যাহাকে আমরা শব্দভাণ্ড নাম দিয়াছি, তাহার ভিতরকার বাতাসের কাঁপুনি আগেকার উদাহরণেরই কাঁপুনির মতো। শব্দভাণ্ড বড় দরকারি জিনিষ। যে-যন্ত্রের শব্দভাণ্ড নানা সুরে ঠিক মতো সাড়া দিয়া কাঁপিতে পারে তাহা অতি মূল্যবান্। টেলি-গ্রাফের তারের খোঁটার গোড়ায় দাঁড়াইলে যে সোঁ-সোঁ শব্দ শুনা যায়, তাহাকেও শব্দ-ভাণ্ডের উদাহরণ বলা যাইতে পারে। এখানে আর একটা ছবি দিলাম। দেখ, ত্রিশূলের মতো এক-খণ্ড ইস্পাতকে বাক্সের উপরে রাখিয়া কাঁপানো হইতেছে। ইহাতে ইস্পাত হইতে প্রবল শব্দ বাহির হইতেছে।
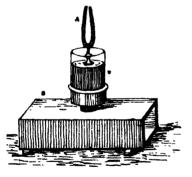
এস্রাজের সারি সারি কানে বারো বা চৌদ্দটা তার আঁটা থাকে। তোমরা লক্ষ্য করিলে দেখিবে, এই যন্ত্রের একটা তার বাজাইলে অন্য কতকগুলি তার আপনিই বাজিয়া উঠে। সকলে হয় ত ইহা দেখ নাই। তোমাদের বাড়িতে, পাড়ায় বা

গ্রামে যদি এস্রাজ থাকে তাহা পরীক্ষা করিয়ো। দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ করিবে। তার ছোঁয়া গেল না, বা বাজানো গেল না,—অথচ তাহা অন্য তারের শব্দে আপনিই বাজিয়া উঠিল! ইহা আশ্চর্য্যের কথাই বটে। কিন্তু তারগুলি কেন আপনি বাজে, তাহার কারণ তোমরা সহজে বুঝিতে পারিবে। এস্রাজের তারগুলির কয়েকটি একই রকমে বাঁধা থাকে। অর্থাৎ প্রত্যেক তারের কাঁপুনির সহিত অপর কয়েকটির কাঁপুনির মিল রাখা হয়। কাজেই তোমার আঙুলের তাড়নায় যে তারটি বাজিয়া উঠিল, তাহার শব্দের ঢেউয়ে সেই রকমে বাঁধা অন্য তারগুলি আর স্থির থাকিতে পারিল না। সেগুলি অনুকূল শব্দের ঢেউয়ে ধাক্কা পাইয়া আপনিই ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। মৃদু শব্দের ঢেউয়ে শব্দভাণ্ডের বাতাস যে-রকমে কাঁপে, ইহা সেই রকমেরই ব্যাপার নয় কি? শব্দভাণ্ডের ভিতরে যে-বাতাস থাকে, তাহা জোরে কাঁপিয়া মৃদু শব্দকে প্রবল করে। এস্রাজে একটা তারের শব্দের ঢেউ অন্য তারকে কাঁপাইয়া শব্দকে বাড়াইয়া তোলে। ব্যাপার একই।

মিহি ও মোটা শব্দ

দুইটা শব্দের মধ্যে কোন্‌টা মিহি এবং কোনটাই বা মোটা, তোমরা তাহা শুনিয়া বুঝিতে পার কি? মনে কর, একটা হুইসিল্‌ এবং একটা শঙ্খ বাজানো গেল। দুইটা হইতে দুই রকমের শব্দ বাহির হইল। এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি মিহি তোমরা বলিতে পার না কি? হুইসিলের শব্দ মিহি এবং শঙ্খের শব্দ মোটা। মনে কর, তুমি চীৎকার করিলে এবং আমিও চীৎকার করিলাম। তোমার গলার কন্‌কনে শব্দে যেন কানে তালা লাগিল। এই দুই শব্দের মধ্যে কোনটা মিহি? তোমার চীৎকারই মিহি, আমার চীৎকার মোটা। ছোটো ছেলে এবং মেয়েদের গলার স্বর মিহি, বয়স্ক পুরুষের গলা মোটা। তোমরা বোধ হয় মনে করিতেছ, মিহি শব্দই বুঝি জোরালো হয়। কিন্তু তাহা নয়। যে-শব্দ অনেক দূর হতে শুনা যায়, তাহাই জোরালো অর্থাৎ প্রবল। শব্দ কি-রকমে জোরালো হয়, তাহা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। শঙ্খের শব্দ মোটা ও জোরালো। ইহা অনেক দূর হইতে শুনা যায়। রাতের বেলায় মশারা কানের গোড়ায় যে পিন্‌পিন্‌ শব্দ করে, তাহা মিহি কিন্তু জোরালো নয়। ইহা দূর হইতে শুনা যায় না। হুইসিলের শব্দ মিহি, অথচ জোরালো। এই শব্দ অনেক দূর পর্য্যন্ত ছুটিয়া চলে। সুতরাং মিহি ও

মোটার সঙ্গে শব্দের জোর-আওয়াজের কোনো সম্বন্ধ নাই। যাহা হউক, শব্দ মিহি ও মোটা কি-রকমে হয়, সেই কথা তোমাদিগকে বলিব।

তোমরা আগেই দেখিয়াছ, সব জিনিষ একই ভাবে কাঁপে না। কোনো জিনিষ তাড়াতাড়ি কাঁপে, আবার কোনো জিনিষ ধীরে কাঁপে। তাড়াতাড়ি কাঁপুনিতে যে-শব্দের ঢেউ হয়, তাহা লম্বায় ছোটো, কোনো নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহার অনেকগুলি আমাদের কানে আসিয়া ধাক্কা দেয়। ধীর কাঁপুনিতে যে-সব ঢেউ হয়, তাহা লম্বায় খুব বড়। কাজেই সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহার অতি অল্পই কানে আসিয়া পৌঁছায়। শব্দ মিহি ও মোটা হইবার মূল কারণ এইখানেই। দুই প্রস্ত শব্দের ঢেউয়ের মধ্যে যেগুলি কানে তাড়াতাড়ি বার বার আঘাত করে, তাহার শব্দ হয় মিহি এবং যেগুলি থামিয়া থামিয়া ধীরে ধীরে কানে আঘাত দেয় তাহারি শব্দ হয় মোটা। মনে কর, কোনো শব্দের ঢেউ সেকেণ্ডে এক শত বার এবং আর একটা শব্দের ঢেউ সেকেণ্ডে দুই শত বার করিয়া কানে ধাক্কা দিতেছে। এই দুইয়ের মধ্যে দুই শত ধাক্কার শব্দ হইবে মিহি এবং এক শতের শব্দ হইবে মোটা। কাজেই ঢেউয়ের ধাক্কার সংখ্যার উপরেই শব্দের মিহি ও মোটা নির্ভর করে। তুমি যখন কথা বল, বা চাৎকার কর, তখন তোমার গলার কাঁপুনিতে বাতাসে খুব ছোটো ছোটো ঢেউ উৎপন্ন হয়। সেগুলি আমাদের কানে তাড়াতাড়ি ধাক্কা দেয়। ইহাতে তোমার গলার স্বর আমরা

মিহি শুনি। আর আমি যখন কথা বলি বা তোমাদের ডাকি, তখন আমার গলার কাঁপুনির ঢেউগুলি বিলক্ষণ লম্বা থাকে। সেগুলি ধীরে ধীরে আসিয়া কানে ধাক্কা দেয়। তাই আমার গলার স্বর হয় মোটা।

ঢেউয়ের সংখ্যা স্থির করা

কোন্ শব্দ সেকেণ্ডে কত বার কানে ধাক্কা দেয়, তাহা ঠিক করার জন্য অনেক রকম যন্ত্র আছে। তোমরা সে-সকল যন্ত্র দেখ নাই, বোধ করি এখন দেখিবার সুবিধাও হইবে না। বড় হইয়া যখন নিজের হাতে বিজ্ঞানের পরীক্ষা করিবে, তখন সেই সব যন্ত্র দেখিতে পাইবে।

তবুও পর-পৃষ্ঠায় শব্দের ঢেউ গুণিয়া ঠিক করার এক রকম যন্ত্রের ছবি দিলাম। ছবিতে যে ঢাকের মতো কালো অংশটা দেখিতেছ, তাহাতে ভূষার কালি-মাখানো কাগজ জড়ানো আছে। একটু আঁচড় লাগিলেই আঁচড়ের জায়গা হইতে কালি উঠিয়া যায়, তখন সেখানে সাদা কাগজ বাহির হইয়া পড়ে। এই কালো ঢাককে হাতল দিয়া ঘুরানো যায়। ছবিতে যে বাঁকা জিনিষটা দেখিতেছ, তাহা ইস্পাতের তৈয়ারি কাঁটা। মাটিতে ঘা মারিলেই ইহা হইতে কন্-কন্ করিয়া শব্দ বাহির হইয়া পড়ে। ইহাতে একটা ছুঁচ্ লাগানো আছে।

মনে কর, এই ইস্পাতের জিনিষের কাঁপুনি হইতে সেকেণ্ডে কতগুলি শব্দের ঢেউ উৎপন্ন হইতেছে, তাহাই যেন আমারা ঠিক করিতে যাইতেছি। ইস্পাতের জিনিষটাকে মাটিতে ঘা মারিয়া কাঁপাইয়া ঢাকের গায়ে ছোঁয়াইয়া রাখা গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঢাক ঘুরিতে লাগিল। এই অবস্থায় যন্ত্রে কি ঘটিবে বলা

কঠিন নয়। ইস্‌পাত যেমন এদিকে-ওদিকে কাঁপিবে, অমনি তাহার মাথায় লাগানো ছুঁচ ঢাকে জড়ানো কাগজের গায়ে ঢেউয়ের মতো আঁচড় কাটিতে থাকিবে। ছবিতে দেখ,
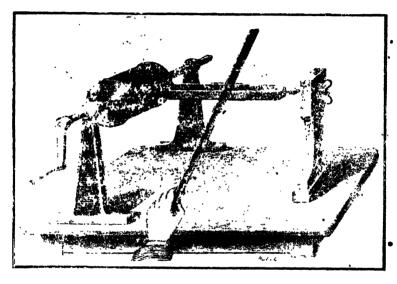
ইস্‌পাতখানি কাঁপিয়া কেমন ঢেউ আঁকিয়া রাখিতেছে। এক-একটা কাঁপুনিতে এক-একটা ঢেউ আঁকা হইতেছে। সুতরাং এক সেকেণ্ডে কতগুলি ঢেউ আঁকা হইল, তাহা গুণিয়া ঠিক করিলে, ইস্‌পাতখানি সেকেণ্ডে কতবার কাঁপিয়াছে জানা যায়। মনে কর, এই রকম কোনো পরীক্ষার কাগজে ২৫৬টা ঢেউ গুণিয়া পাওয়া গেল। কাজেই বলিতে হয়, ইস্‌পাতখানা কাঁপিয়া যে-শব্দের ঢেউ উৎপত্তি করিয়াছিল, প্রতি সেকেণ্ডে তাহার ২৫৬টি আমাদের কানে ধাক্কা দিয়াছে।

তোমরা বোধ হয় মনে করিতেছ, এই যন্ত্র দিয়া কেবল ঐ ইস্‌পাতের মতো জিনিষেরই শব্দের ঢেউ গোণা যায়। কিন্তু তাহা নয়। তোমার বা আমার গলার শব্দ এবং বাঁশী বা হুইসিলের আওয়াজ কতগুলি ঢেউয়ে যে উৎপন্ন হইল, তাহাও ঠিক্ করা যায়। ঐ রকম বাঁকানো ইস্‌পাত ছোটো বড় নানা আকারে তৈয়ারি থাকে এবং প্রত্যেকটি কাঁপিয়া সেকেণ্ডে কতগুলি করিয়া ঢেউ তোলে, তাহাও জানিয়া রাখা হয়। তার পরে তোমার বা আমার গলার শব্দ, কোন্ ইস্‌পাতের শব্দের সহিত মিলিয়া গেল, তাহা ঠিক করা হয়। ইহাতেই কত কাঁপুনিতে সুর উৎপন্ন হইল, তাহা জানা যায়।

একটা উদাহরণ দিলে বোধ হয় আগেকার কথাগুলি তোমরা ভালো করিয়া বুঝিতে পারিবে। তোমাদের মধ্যে কেহ গান গাহিতে পার কিনা জানি না। মনে করা যাউক যেন তুমি গান গাহিতে পার এবং তোমার গলার স্বর সুমিষ্ট। প্রতি সেকেণ্ডে কতগুলি শব্দের ঢেউ কানে ধাক্কা দিয়া তোমার গলার সুর উৎপন্ন করিতেছে, ইহাই যেন স্থির করিতে হইবে। তুমি গলায় সুর দিতে লাগিলে, আর আমি সেই ছোটো বড় নানা ইস্‌পাতকে বাজাইয়া দেখিতে লাগিলাম, কোন্ ইস্‌পাতের শব্দের সহিত তোমার গলার সুর মিলিয়া যায়। মনে কর,

একখানি ইস্‌পাতের শব্দের সহিত তোমার গলার সুর অবিকল মিলিয়া গেল। কাজেই বলিতে হয়, ঐ ইস্‌পাত সেকেণ্ডে যত বার কাঁপিয়া শব্দ উৎপন্ন করিল, তুমিও তত বার গলা কাঁপাইয়া স্বর বাহির করিলে। কিন্তু ইস্‌পাতখানি সেকেণ্ডে কতগুলি করিয়া ঢেউ তোলে তাহা জানা আছে। সুতরাং তোমার গলার সুর সেকেণ্ডে কতগুলি শব্দের ঢেউ তুলিল, তাহাও জানা গেল। দেখ, শব্দের ঢেউ গোণার কেমন সুন্দর উপায় রহিয়াছে।

শব্দ-বোধ

মানুষ খুব বুদ্ধিমান প্রাণী। তাহারা দেখিয়া-শুনিয়া অনেক বিষয় চিন্তা করিতে পারে এবং কোন্ কারণে কি ঘটে, তাহাও বুদ্ধি খাটাইয়া জানিয়া লইতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর চোখ কান নাক প্রভৃতি যে-সব ইন্দ্রিয় দিয়াছেন, সেগুলির স্বাভাবিক শক্তি মানুষ বুদ্ধির জোরে বাড়াইতে পারে নাই।

তোমরা বোধ হয় মনে কর, যে-সব আলো আমরা চোখে দেখিতে পাই, কেবল সেই আলোগুলিই আলো; জগতে বুঝি আর অন্য আলো নাই। কিন্তু তাহা নয়। অসংখ্য আলোতে এই জগৎ আচ্ছন্ন। এইগুলির মধ্যে অতি অল্প কয়েকটিকে আমরা দেখিতে পাই। আবার দৃষ্টিশক্তির কথা ভাবিয়া দেখ। ইহাতেও মানুষ খুবই দুর্ব্বল। মাঠের কোন্ কোণে কোথায় একটা ছোটো মরা জন্তু পড়িয়া আছে, চিল-শকুনেরা আকাশের দুই মাইল উপর হইতে তাহা দেখিতে পায়, অথচ আমরা কুড়ি হাত তফাতের ছোটো জিনিষ দেখিতে পাই না। নাকের কথা ভাবিয়া দেখ। নাক দিয়া আমরা গন্ধ জানিয়া লই। ভালো গন্ধে আনন্দ পাই, মন্দ গন্ধে নাকে কাপড় দিই। কুকুর শিয়াল প্রভৃতি জন্তুরা গন্ধ শুঁকিয়া সে-রকম আনন্দ পায় কিনা জানি না। কিন্তু আমাদের চেয়ে যে তাহাদের ঘ্রাণশক্তি বেশী, তাহা আমরা জানি। গন্ধ শুঁকিয়া কুকুরেরা

এক মাইল তফাতে কি আছে বাহির করিতে পারে। পোষা কুকুরকে বাড়িতে রাখিয়া তোমরা যদি গ্রামের কোনো জায়গায় বেড়াইতে যাও,তবে কেবল গন্ধ শুঁকিয়া সে তোমার কাছে গিয়া হাজির হয়। কিন্তু আমরা অতি নিকটের জিনিষের গন্ধও বুঝিতে পারি না। শব্দ শুনার ব্যাপারেও ঠিক এই কথাই বলা যায়। পৃথিবীতে নানা জিনিষ কাঁপিয়া সর্ব্বদাই নানা রকমের ঢেউ উৎপন্ন করিতেছে। কিন্তু সকল ঢেউয়ে আমরা শব্দ শুনিতে পাই না। ঢেউ কানের ভিতর ,আসিয়া ঠেকিতেছে, অথচ শব্দ শুনিতে পাইতেছি না, ইহা সর্ব্বদাই ঘটিতেছে। তোমাদিগকে সেই সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিব।

মনে কর, তানপুরা বা সেতারের শব্দ লইয়া পরীক্ষা করা যাইতেছে। সেতারের তার খাটো করিলে বা খুব টানিয়া বাঁধিলে তাহা খুব ঘন ঘন কাঁপে। আবার তাহাকেই ঢিলা করিলে বা লম্বায় বড় করিলে ধীরে ধীরে কাঁপে। এ সব কথা তোমরা আগেই শুনিয়াছ। তাহা হইলে দেখ, একগাছি তার সেকেণ্ডে কুড়িবার কাঁপিতে পারে, আবার দুই শত বা দুই হাজার বারও কাঁপিতে পারে। মনে করা যাউক, তারটি যেন সেকেণ্ডে কুড়ি বার কাঁপিতেছে। কাজেই সেকেণ্ডে কুড়িটা ঢেউ আমাদের কানে ধাক্কা দিতেছে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, এই ঢেউয়ে আমাদের শব্দ-বোধ হয় না,—অর্থাৎ তার কাঁপে অথচ শব্দ শুনিতে পাই না। এখন মনে করা যাউক, তার কাঁপিয়া যেন সেকেণ্ডে দুই শত ঢেউয়ের উৎপত্তি

করিতেছে এবং সেগুলিতে আমাদের কান সেকেণ্ডে দুই শত ধাক্কা পাইতেছে। এই ধাক্কায় আমরা শব্দ শুনিতে পাইব। তার পরে মনে কর, তারটি যেন সেকেণ্ডে পঞ্চাশ হাজার বার কাঁপিতেছে, ইহাতে প্রতি সেকেণ্ডে পঞ্চাশ হাজার ঢেউ আমাদের কানে ধাক্কা দিবে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, এই রকম ঘন ধাক্কায় আমরা শব্দ বুঝিতে পারি না। একটা তার বা অন্য কোনো জিনিষ সেকেণ্ডে একটা ঢেউ তুলিতে পারে বা লক্ষ-লক্ষ-কোটি-কোটি ঢেউও সৃষ্টি করিতে পারে। তাহা হইলে দেখ, আমাদের কান সব ঢেউয়ের শব্দ শুনিতে পায় না। ঢেউয়ের সংখ্যা যখন খুব কম থাকে, তাহাতে কান সাড়া দেয় না, এবং ঢেউয়ের সংখ্যা যখন খুব বেশী হয়, তখনো তাহার শব্দ শুনা যায় না।

কতগুলি ঢেউ প্রতি সেকেণ্ডে কানে ধাক্কা দিলে শব্দ শোনা আরম্ভ হয় এবং ঢেউয়ের সংখ্যা বাড়িয়া কতগুলিতে আসিয়া দাঁড়াইলে শব্দ-শুনা বন্ধ হয়, তাহা ঠিক বলা কঠিন। কারণ ইন্দ্রিয়ের শক্তি সকল মানুষের এক নয়। তুমি দূরের জিনিষ যত সব স্পষ্ট দেখিতে পাও, আমি তত স্পষ্ট দেখিতে পাই না। কোনো ভালো বা মন্দ গন্ধ বাহির হইলে আমি যত শীঘ্র বুঝিতে পারি, হয় ত তুমি তত শীঘ্র বুঝিতে পার না। ইন্দ্রিয়-শক্তির এই যে কম-বেশি ভাব ইহা মানুষের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়। সেইজন্যই বলিতেছিলাম, যে-সব শব্দ শুনা যায়, তাহার কাঁপুনির সীমা ঠিক করিয়া বলা কঠিন।

যাহা হউক, এ সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। তাহা হইতে জানা যায়, প্রতি সেকেণ্ডে ত্রিশটা করিয়া শব্দের ঢেউ কানে ঠেকিলে শব্দের জ্ঞান হয়। তার পরে ঢেউয়ের সংখ্যা বাড়িয়া যখন সেকেণ্ডে চল্লিশ হাজারের উপরে উঠে তখন সে-সকল ঢেউয়ের ধাক্কায় আর শব্দ শুনা যায় না। কিন্তু এ রকম লোকও আছে, যাহারা ঢেউয়ের সংখ্যা কুড়ি হাজারের উপরে উঠিলে আর শব্দ শুনিতে পায় না।

ডপ্‌লারের পরীক্ষা

ডপ্‌লার সাহেব মহাপণ্ডিত ছিলেন। অনেক পরীক্ষা করিয়া তিনি বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। ঢেউয়ের সংখ্যা বাড়িলে এবং কমিলে যে, শব্দ মিহি ও মোটা হয়, সে সম্বন্ধে তিনি একটি সুন্দর পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাহারি কথা তোমাদিগকে এখানে বলিব।

মনে কর, কোনো লোক যেন দূরে দাঁড়াইয়া ধনুক হইতে তীর ছুড়িতেছে, আর তুমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া সেকেণ্ডে কতগুলি তীর কাছে আসিতেছে তাহা গুণিতেছ। মনে করা যাউক, লোকটা যেন সেকেণ্ডে পাঁচটা করিয়া তীর ছুড়িতেছে। কাজেই সেকেণ্ডে পাঁচটা তীর তোমার কাছে আসিতেছে, এবং তুমি তাহা এক, দুই, তিন করিয়া গুণিতেছ। তীরন্দাজ লোকটার কি খেয়াল হইল জানি না, সে তীর ছুড়িতে লাগিল, আর তোমার কাছে দৌড়াইয়া আসিতে লাগিল। তুমি কিন্তু ঠিক এক জায়গাতেই খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলে। এখন কতগুলি তীর তোমার কাছে আসিয়া পড়িবে, বলিতে পার কি? ঠিক বলা যায় না বটে, কিন্তু আগে যতগুলি আসিতেছিল এখন যে তাহার চেয়ে বেশি তীর কাছে আসিবে তাহা বিলক্ষণ বুঝা যায়।

ইহারি উল্টা ব্যাপার কি হয়, দেখা যাউক। মনে কর, এখন সেই তীরন্দাজ লোকটা যেন তীর ছুড়িতে ছুড়িতে কাছ হইতে দূরে পালাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তুমি আগেকার মতো ঠিক এক জায়গাতেই দাঁড়াইয়া রহিলে। মনে থাকে যেন লোকটা সেই পাঁচটা করিয়া তীর ছুড়িতে ছুড়িতে তোমার কাছ হইতে দূরে যাইতে লাগিল। এখন কতগুলি করিয়া তীর তোমার কাছে আসিবে বলিতে পার কি? ঠিক বলা যায় না। হয় ত তিনটা বা চারিটা। কিন্তু আগে যতগুলি আসিতেছিল এখন যে তাহা অপেক্ষা কম আসিবে, তাহা সুনিশ্চিত।

শব্দের ঢেউয়ে কতকটা এই রকমের ব্যাপার দেখা যায়। রেলের গাড়ি হুইসিল্ বাজাইয়া ষ্টেশন ছাড়ে। এই হুইসিলের একটা সুর আছে। কতগুলি শব্দের ঢেউয়ে সেই সুর উৎপন্ন হইল, তাহা পরীক্ষা দ্বারা ঠিক করা কঠিন নয়। মনে কর, সেকেণ্ডে তিন শত শব্দের ঢেউয়ে যেন কোনো হুইসিলের শব্দ উৎপন্ন হইল। গাড়ী ছাড়িল এবং ঘণ্টায় তিন মাইল বেগে দূরে যাইতে লাগিল। আবার সঙ্গে সঙ্গে হুইসিল্ বাজাইতে লাগিল। তুমি যেন ষ্টেশনে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া হুইসিলের শব্দ শুনিতে লাগিলে। এখন কতগুলি শব্দের ঢেউ তোমার কানে ধাক্কা দিবে বলিতে পার কি? আগে সেকেণ্ডে তিনশত ঢেউ কানে ঠেকিতেছিল। তীরন্দাজ লোকটা যেমন তীর ছুড়িতে ছুড়িতে দূরে যাইতেছিল, এখন গাড়িখানা শব্দের ঢেউ তুলিতে তুলিতে দূরে যাইতেছে। কাজেই শব্দের

ঢেউ এখন সেকেণ্ডে তিনশত বারের কম কানে ধাক্কা দিবে। কিন্তু তোমরা জানো, কম শব্দের ঢেউ কানে ধাক্কা দিলে সুর মোটা হয়। সুতরাং ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া গাড়ীখানা যে সুরে হুইসিল বাজাইয়াছিল, এখন তাহা অপেক্ষা অনেক মোটা সুর শুনা যাইবে।

ইহারি ঠিক্ উল্টা ব্যাপার দেখা যায়, যখন বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে গাড়ি ষ্টেশনের দিকে ছুটিয়া আসে। বাঁশী হইতে যেন পূর্ব্বের মত তিন শত শব্দের ঢেউ বাহির হইতেছে। তুমি ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া আছ এবং গাড়ি সেকেণ্ডে তিন শত ঢেউ ছাড়িতে ছাড়িতে তোমার কাছে আসিতেছে। কাজেই দেখ, সেই তীরন্দাজ যেমন সেকেণ্ডে পাঁচটা তীর ছুড়িতে ছুড়িতে তোমার কাছে আসিতেছিল, এখানে যেন তাহাই ঘটিল। সেকেণ্ডে তিন শত ঢেউ ছাড়িতে ছাড়িতে গাড়ি কাছে আসিতেছে। সুতরাং প্রতি সেকেণ্ডে তিন শতের অনেক বেশী ঢেউ আসিয়া তোমার কানে ধাক্কা দিবে এবং ইহার ফলে তুমি বাঁশীর স্বাভাবিক সুরের চেয়ে মিহি সুর শুনিবে।

চল্‌তি গাড়ির বাঁশীর আওয়াজ যে এই রকমে মিহি ও মোটা হয়, ইহা তোমরা দেখ নাই কি? লক্ষ্য করিলে তোমরা ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে। আমরা ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া অনেকবার ইহা পরীক্ষা করিয়াছি। তাহা হইলে বেশী ঢেউ কানে গেলে যে শব্দ মিহি হয় এবং কম গেলে মোটা হয়, এই পরীক্ষা হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়।

কোলাহল ও সুর

স্কুলে ছুটির ঘণ্টা পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ শত ছেলে আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। কি ভয়ানক গণ্ডগোল! যেন কান পাতা যায় না। ইহাকেই বলে কোলাহল। রাত দুপুরে এক দল শিয়াল দূরের মাঠে চেঁচামেচি আরম্ভ করিল। গ্রামের কোনো ঘরে আগুন ধরিল; হাজার লোক জড় হইয়া গণ্ডগোল সুরু করিয়া দিল। একটা কাক মরিল, অমনি পঞ্চাশটা কাক একত্র হইয়া চেঁচাইতে লাগিল। এগুলিকেও বলা হয় কোলাহল। মেলার সময়ে পাঁচ হাজার লোক একত্র হইয়াছে। তাহাদের সকলের গলার স্বর কানে আসিতেছে। এই শব্দও কোলাহল। কোলাহলে একটুও মধুরতা বা একটুও কোমলতা থাকে না। তাহা শুনিতে কর্কশ,—থামিলেই যেন বাঁচা যায়।

বাগানের গাছে বসিয়া কোকিল ডাকিতেছে। শানাইয়ের সুর দূর হইতে কানে আসিতেছে। এস্‌রাজ সেতার বা হারমোনিয়ম্ বাজিতেছে, আবার তাহার সঙ্গে একজন সুন্দর গান করিতেছে। এই সকল শব্দ মধুর; কানে পীড়া দেয় না; শুনিতে ভালো লাগে। এই রকম শব্দকে বলা হয় সুর।

তাহা হইলে দেখ, কোলাহল শুনিতে ভালো লাগে না, কিন্তু সুর কানে গেলে বেশ ভালোই বোধ হয়। হাত হইতে

কাঁসার বাটি পড়িয়া গেলে, হাতে তালি দিলে, বন্দুক ছুড়িলে বা লোহাতে হাতুড়ির ঘা মারিলে যে-সকল শব্দ হয়, তাহা ক্ষণিক। অর্থাৎ এগুলির ঢেউ ধারাবাহিক কানে ধাক্কা দেয় না। কিন্তু যাহাদের আমরা কোলাহল এবং সুর বলি, তাহা ক্ষণিক শব্দ নয়। তাহাদের ঢেউ ধারাবাহিক কানে ধাক্কা দিয়া আমাদিগকে শব্দ শুনায়।

সকলি বুঝা গেল। কিন্তু কোলাহল শুনিতে কেন কর্কশ হয়, এবং সুর শুনিতে কেন মধুর হয়, তাহা বোধ করি তোমরা জানো না। বৈজ্ঞানিকেরা তাহা স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, যখন শব্দের ঢেউ একের পরে একটি এলোমেলো-ভাবে কানে ধাক্কা দেয়,তখন তাহাতে আমরা কর্কশ কোলাহল শুনিএবং যখন বেশ নিয়মিত-ভাবে কোনো শব্দের ঢেউ কানে আসিয়া ঠেকে তখন তাহাতে মধুর সুর শুনিতে পাই। ঘড়ির পেণ্ডুলম্ কেমন দোলে, তাহা তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। পেণ্ডুলম্ কখনো তাড়াতাড়ি দুলিতেছে এবং কখনো ধীরে দুলিতেছে, ইহা কোনো ঘড়িতেই দেখা যায় না। শব্দের ঢেউ যখন পেণ্ডুলমের দোলনের মতো ঠিক্ তালে তালে সমান জোরে কানে ধাক্কা দেয়, তখন তাহাতেই শুনা যায় সুর। আর যখন নিয়ম বা তাল রক্ষা না করিয়া কতকগুলি ঢেউ এলোমেলো-ভাবে কখনো জোরে কখনো আস্তে কানে ধাক্কা দেয়, তখন তাহাতেই শুনা যায় কোলাহল। ষ্টীমারের বা কারখানার কলে কি ভয়ানক শব্দ হয়, তোমরা হয় ত তাহা শুনিয়াছ। এই

শব্দে একটু মধুরতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, ইহা কোলাহল। চাকার শব্দ, ষ্টিমের শব্দ এবং আরো কত রকম শব্দের ঢেউ বেতালা-ভাবে কানে ধাক্কা দেয় বলিয়াই উহা কোলাহল হইয়া দাঁড়ায়। স্থির জলে ঢিল ফেলিলে জলের ঢেউ যেমন নিয়মিত-ভাবে কাতারে কাতারে চলে, সুরের ঢেউও চলে যেন সেই রকমে। ঝড়ের সময়ে নদীর জল কখনো উঁচু কখনো নীচু, কখনো এ-মুখো, কখনো সে-মুখো হইয়া যে-সব ঢেউয়ের সৃষ্টি করে, কোলাহলের ঢেউ যেন ঠিক সেই রকমেরই অনিয়মিত।

সুরের ঢেউ নির্দ্দিষ্ট সময়ে একে একে আমাদের কানে ধাক্কা দেয়, ইহার ফলে আমরা একটা ধারাবাহিক লাগাড় সুর শুনিতে পাই। এক ঢেউয়ের সঙ্গে পরের ঢেউয়ের বিচ্ছেদ আছে, অথচ সুরে বিচ্ছেদ নাই। ইহা কেন হয়, তোমরা বোধ হয় তাহা জানো না। আকাশে বিদ্যুৎ চমকায় অতি অল্পক্ষণের জন্য। সেই সময়টা এক সেকেণ্ডের দশ হাজার ভাগেরও কম। কিন্তু আমরা বিদ্যুতের আলো দেখি অনেক ক্ষণ ধরিয়া। অর্থাৎ বিদ্যুৎ নিভিয়া যাওয়ার পরে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার রেশ আমাদের চোখে থাকে। ইহাকে তোমরা আমাদের চোখের দুর্ব্বলতা বলিতে পার। কিন্তু এই দুর্ব্বলতা স্বাভাবিক। ইহা আছে বলিয়াই হাউই বাজি যখন আকাশে উঠে, তখন তাহাকে একটা আলোর রেখার মতো দেখায়; তুব্‌ড়ি পুড়িলে তাহাকে আলোর ফোয়ারা বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, চোখের মতো আমাদের কানেরও ঐ রকম দুর্ব্বলতা

আছে। শব্দের ঢেউ কানে ঠেকিয়া লোপ পাইবা মাত্র তাহার ক্রিয়া কান হইতে লোপ পায় না। সেই ঢেউ হইতে যে-শব্দ হইল তাহার একটা রেশ কানে লাগিয়া থাকে এবং তাহার সঙ্গে নূতন শব্দ যোগ দিয়া পূর্ব্বের শব্দকে দীর্ঘ করিয়া তোলে। এই রকমে একে একে যত ঢেউ কানে আসিয়া লাগে, ততই রেশে রেশে মিলিয়া শব্দটা অবিচ্ছিন্ন অর্থাৎ লাগাড় হইয়া উঠে।

এখন বোধ হয় তোমরা বুঝিলে, সুরের ঢেউ নিয়মিত। ইহা নির্দ্দিষ্ট সময়ের শেষে সমান জোরে কানে ধাক্কা দেয়। কিন্তু কোলাহলের ঢেউ অনিয়মিত। ইহার এক ঢেউয়ের পরে অন্য ঢেউ যে কখন আসিবে, তাহা জানা যায় না এবং তাহাদের ধাক্কার জোরেও ঐক্য থাকে না। সুরের ঢেউ যেন দুল্‌কি চালের ঘোড়া, তাহার চারিখানা পা যেন ঠিক তালে তালে একটা নিয়মের বশে চলে। সোয়ার ঘোড়ায় চাপিয়া আরাম পায়। আর কোলাহল যেন অশিক্ষিত বেচাল ঘোড়ার এলোমেলো দৌড়। কখন কোথায় তাহার পা পড়ে, ঠিক্ বলা যায় না। সোয়ারকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হয়।

তোমরা বোধ হয় মনে কর,কোনো বাদ্যযন্ত্র বা কালোয়াতের গলা ছাড়া অন্য কিছু হইতে সুরের ঢেউ বাহির হয় না। কিন্তু একথা ঠিক্ নয়। যেখান হইতেই হউক শব্দের ঢেউ তালে তালে কানে পৌঁছিলেই আমরা সুর শুনিতে পাই। পকেটে থাকিয়া ঘড়ি টিক্-টিক্ শব্দ করে। এই শব্দ খুব নিয়মিত।

ইহার ঢেউ হয় ত সেকেণ্ডে একবার কি দু'বার করিয়া কানে ধাক্কা দেয়। কিন্তু এই ঘড়িই যদি সেকেণ্ডে ত্রিশ-চল্লিশ বার টিক্-টিক্ করে, তাহা হইলে তোমরা নিশ্চয়ই একটি সুস্বর শুনিতে পাইবে। যখন পায়রা উড়িয়া বেড়ায় তখন তালে তালে তাহার ডানা হইতে পটাপট্ শব্দ বাহির হয়। কিন্তু সে শব্দ দ্রুত হয় না, সেকেণ্ডে হয় ত একটার বেশী কানে যায় না। পায়রারা যদি সেকেণ্ডে এক শত বা দেড় শত বার ডানার ঝাপট্ দিতে পারিত, তাহা হইলে ঐ শব্দে নিশ্চয়ই একটা মিষ্ট সুর বাহির হইত।

মশা মাছি ও ভ্রমরেরা যে গুন্-গুন্ শব্দ করে, তাহা উহাদের গলার শব্দ নয়, ডানা হইতেই উহা বাহির হয়। সেকেণ্ডে তিন-চারি শত বা তাহারো অধিক বার ডানা নাড়িয়া শব্দ করে বলিয়া সেই শব্দই হইয়া দাঁড়ায় সুর। বাতাস বহিলে ফাটা বাঁশের ফাঁকে বাতাস গিয়া ফক্-ফক্ শব্দ করে। ঝড়ের সময়ে সেই শব্দই তাড়াতাড়ি হয়, অর্থাৎ সেকেণ্ডে হয় ত এক শত বা দেড় শত শব্দ বাহির হয়। ইহার ফলে যে কি হয়, তাহা বোধ করি তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। তখন সেই ফক্-ফক্ আওয়াজই হইয়া দাঁড়ায় ঠিক বাঁশীর শব্দ। মনে হয় যেন কে ঝড়ের মধ্যে বাঁশ-বনে বসিয়া বাঁশী বাজাইতেছে। রেলের গাড়ি "হুস্-হুস্" শব্দে ষ্টিম্ ছাড়িতে ছাড়িতে ষ্টেশনে হাজির হয়। এই শব্দ বোধ করি সেকেণ্ডে একবারের বেশী হয় না। তোমরা শুনিয়াছ, সেকেণ্ডে ত্রিশটা শব্দের ঢেউ কানে না আসিলে একটা

দাগাড় শব্দ শুনা যায় না। সুতরাং রেলের গাড়ি যদি সেকেণ্ডে অন্তত চল্লিশ-পঞ্চাশ বার "হুস্-হুস্" করিয়া ছুটিয়া আসিত, তাহা হইলে তোমরা শঙ্খের চেয়েও একটা উঁচু সুর শুনিতে পাইতে। করাতিরা যখন উকো ঘসিয়া করাতে ধার দেয়, তখন এক রকম সুর শুনা যায়। সুরটা মধুর নয়, শুনিলে যেন গা শির্-শির্ করে, কিন্তু তবুও উহা সুর। কেমন করিয়া এই সুর হয়, তোমরা বোধ হয় তাহা জানো না। উকোর গায়ে খুব ঘন ঘন উঁচু সূতো, কাটা থাকে। করাতের দাঁতে উকো টানিলে প্রত্যেক সূতার ঘষানিতে এক-একটা শব্দের ঢেউ বাহির হয়। এই ঢেউয়ের সংখ্যা যখন সেকেণ্ডে পঞ্চাশ-ষাট্ বা তাহারো বেশী হইয়া দাঁড়ায়, তখন সেগুলির ধাক্কাতেই আমরা সুর শুনিতে থাকি। স্লেটে তোমরা কি-এক-রকমে পেন্সিল্ ঘষিতে থাকো, অমনি একটা শব্দ বাহির হইতে আরম্ভ হয়। ইহাও একটা সুর। কিন্তু ভালো সুর নয়,শুনিতে মিষ্টি নয়। করাতে উকো ঘষিলে যেমন করিয়া সুর বাহির হয়, এই সুরও ঠিক্ সেই রকমেই বাহির হয়। আর কত উদাহরণ দিব। কি রকমে সুর উৎপন্ন হয়, তোমরা এখন নিজেরাই তাহার অনেক উদাহরণের কথা বলিতে পারিবে।

বাদ্যযন্ত্র

বাদ্য-যন্ত্র তোমরা কত রকম দেখিয়াছ জানি না। বোধ করি, সেতার এস্‌রাজ ঢাক ঢোল শানাই কাঁসি হার্‌মোনিয়ম্‌ পিয়ানো খঞ্জনি মৃদঙ্গ করতাল প্রভৃতি অনেক যন্ত্র দেখিয়াছ। বাদ্যযন্ত্র নানা রকম থাকিলেও তাহাদিগকে কিন্তু চারিটি প্রধান ভাগের মধ্যে ফেলা যায়। এই চারিটি ভাগের নাম দেওয়া যাইতে পারে, বীণা-যন্ত্র, বেণু-যন্ত্র, পটহ-যন্ত্র এবং কাংস্য-যন্ত্র।

কোন্‌ যন্ত্র কোন্‌ ভাগে পড়িবে তাহা বলা কঠিন নয়। তানপুরা সেতার এস্‌রাজ সুর-বাহার সারঙ্গী বেহালা সারিন্দা পিয়ানো প্রভৃতি তারের যন্ত্র মাত্রেই বীণা-যন্ত্র। শঙ্খ, মুরলী, তোমাদের খেলার তালপাতার বাঁশী, ক্লারিয়োনেট প্রভৃতি ফুঁয়ের যন্ত্রগুলি বেণু-যন্ত্র। ঢাক ঢোল্‌ তবলা মৃদঙ্গ প্রভৃতি চাম্‌ড়ার যন্ত্রগুলি পটহ-যন্ত্র। কাঁসর ঘণ্টা করতাল মন্দিরা প্রভৃতি কাংস্য-যন্ত্র।

কি রকমে এই চারি শ্রেণীর যন্ত্র হইতে নানা প্রকার সুর বাহির হয়, একে একে সেই সকল কথা তোমাদিগকে বলিব। তোমরা বোধ হয় মনে করিতেছ, যাহারা গান-বাজনা করে তাহারাই এই সব যন্ত্রের বিষয় জানুক্‌। কিন্তু ইহা মনে করা

ভুল। যে-প্রকারে বাদ্যযন্ত্র হইতে সুর বাহির হয়, তাহা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ব্যাপার। সাধারণ ওস্তাদেরা তাহার খোঁজ রাখেন না। তাঁহারা কান দিয়া সুর চিনিয়া লন। তা'র পরে সুরে সুরে ভরপুর হইয়া আনন্দ উপভোগ করেন এবং দশজনকে আনন্দিত করেন। কিন্তু যিনি বৈজ্ঞানিক তাঁহাকে এরকমে মশ্‌গুল হইয়া থাকিলে চলে না। তাঁহাকে সুরের গোড়ার খবর সংগ্রহ করিতে হয়। সেই খবরগুলি তোমাদের জানিয়া রাখা ভালো।

বীণা-যন্ত্র

তারের বাদ্যযন্ত্র মাত্রেই বীণা-যন্ত্র। আমাদের প্রাচীন বাংলা পুঁথিতে এই যন্ত্রের নাম দেওয়া হইয়াছে তত-যন্ত্র। মা সরস্বতী বীণাপাণি। সকল বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী মায়ের এক হাতে বেদ-বেদাঙ্গ প্রভৃতি সর্ব্ববিদ্যার পুঁথি, অন্য হাতে বীণা। আমাদের প্রাচীন পিতামহদের নিকটে উভয়ই ছিল তুল্য-মূল্য। মহর্ষি নারদ ছিলেন মহাজ্ঞানী ও ভগবদ্‌ভক্ত। বীণা-যন্ত্রই তাঁহার জ্ঞানকে পূর্ণ করিয়াছিল।

যাহা হউক, তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি, একতারা তানপুরা সেতার এস্‌রাজ সারঙ্গী বেহালা সারিন্দা সকলি বীণা-যন্ত্র। তা' ছাড়া, এই সকল যন্ত্রের তার যত মোটা ও লম্বা হয় এবং তাহার টান যত কম হয়, শব্দও ততই মোটা হইতে আরম্ভ করে, একথাও তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। কিন্তু মিহি সুরের জন্য তারের টানকে বেশি এবং তাহার দৈর্ঘ্য ও স্থূলতাকে কম না করিলে চলে না। তোমরা এ সকল কথাও আগে শুনিয়াছ। তাই তাহার আর আলোচনা করিব না।

যাত্রা কীর্ত্তন প্রভৃতিতে তোমরা অনেক গান শুনিয়াছ। তা' ছাড়া সেতার এস্‌রাজ হারমোনিয়ম্ বেহালা আরো কত কি যন্ত্রে ভালো ভালো গৎ ও গান বাজাইতে দেখিয়াছ। ইহা

হইতে বোধ হয় জানো, একটা মাত্র সুরে গান গাওয়া বা গান বাজানো যায় না। হুইসিল্ হইতে কেবল একটা মাত্র সুর বাহির হয়। কেবল এই সুরে কেহ কি গান বাজাইতে পারে? কখনই পারে না। একটা সুরে গান হয় না। তোমাদের তালপাতার বা নারিকেল-পাতার বাঁশীতেও গান হয় না। শঙ্খ হইতে সাধারণত একটা সুরই বাহির হয়, তাই শঙ্খে গান হয় না। কোকিলের ও পাপিয়ার গলার সুর মিষ্ট। লক্ষ্য করিলে দেখিবে, তাহা শঙ্খ বা হুইসিলের মতো একটা স্বর নয়। এই সুর কখনো মিহি ও কখনো মোটা হয়,এবং মিহিতে ও মোটাতে শুনিতে ভালো লাগে। এই জন্যই কোকিলের ডাককে বলে, কোকিলের গান। একতারায় একটা তার টানিয়া বাঁধা থাকে। সুতরাং তাহা হইতে একটা সুরই বাহির হয়। এই সুরেও গান হয় না। বাউলেরা নাচিতে নাচিতে যখন যন্ত্রের দুই পাশের বাঁশের ফলকে টিপ্ দেয়, তখন সেই একটা তারই কখনো ঢিলে কখনো আঁটা হইয়া নানা সুর বাহির করিতে থাকে। তখন একতারায় সঙ্গীতের আমেজ পাওয়া যায়। তানপুরার তারের সুরেও গান হয় না। কালোয়াৎ গান করেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে তানপুরার তারে অঙ্গুলি তাড়না চলে। ইহাতে যে সুর বাহির হয় তাহাকেই ভিত্তি করিয়া কালোয়াৎ গলার সুরে মিহি-মোটা খেলাইতে থাকেন।

পর-পৃষ্ঠায় একটা যন্ত্রের ছবি দিলাম। ইহাতে একটি মাত্র তার আছে। সুতরাং ইহাকে একতারা যন্ত্রই বলা যাইতে

পারে। আমরা বেহালা এস্রাজ সেতার প্রভৃতি যন্ত্রের কানে মোচড় দিয়া তারগুলিকে টানি বা আল্গা করি। ইহাতে সুর মিহি এবং মোটা হয়। এই যন্ত্রের তারের সঙ্গে ভার ঝুলানো আছে। ভার কম থাকিলে তার আল্গা হয় এবং
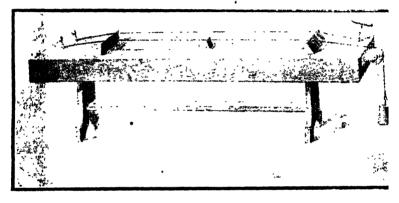
ভার বেশি চাপাইলে তারে টান পড়ে। এই রকমে একটা তারেও মিহি-মোটা সুর বাহির করা যায়। মনে কর, যন্ত্রটির তারে যেন ২৮ পাউণ্ড অর্থাৎ চৌদ্দ সের ভার চাপানো আছে। এখন তার টানিয়া ছাড়িয়া দিলে কি হইবে ? তার কাঁপিতে থাকিবে। কতবার কাঁপিবে তাহা হিসাব করিয়া বলিতে হয়।

মনে কর, সেকেণ্ডে তিন শত বার কাঁপিল ও প্রত্যেক কাঁপুনিতে এক-একটা শব্দের ঢেউ উঠিল, এবং সেগুলি সেকেণ্ডে তিন শত বার করিয়া কানে আঘাত দিতে থাকিল। আমরা একটা সুর শুনিলাম। তারটিকে যতক্ষণ বদ্লানো না যাইবে এবং তাহার টান ও দৈর্ঘ্য যতক্ষণ একই থাকিবে,

ততক্ষণ যতবার তোমরা তারে ঘা দিবে, একই সুর তার হইতে বাহির হইবে। একটা তানপুরা বা সেতারের তার টানিলেও তোমরা তাহাই দেখিতে পাইবে। এক সুরে গৎ বা গান বাজানো যায় না। এই রকম যন্ত্রেও সঙ্গীত হয় না।

এখানে ঐ যন্ত্রেরই আর একটা ছবি দিলাম। এই তারের ঠিক মাঝখানটিকে যদি একটা পালক দিয়া ছোঁয়ানো যায়
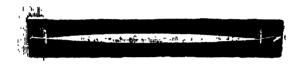
এবং বেহালার ছড় দিয়া যদি কোনো অর্দ্ধেককে বাজানো যায়, ইহাতে ডাহিনের অর্দ্ধেকের সঙ্গে বামের অর্দ্ধেকও কাঁপিবে। কিন্তু সুরটা কি-রকম শুনাইবে তোমরা বলিতে পার কি? তোমরা আগেই জানিয়াছ, সমস্ত তার কাঁপিয়া যতগুলি ঢেউ উৎপন্ন ক'রে অর্দ্ধেক তারে তাহারি দ্বিগুণ, এক-তৃতীয় তারে তাহারি তিনগুণ, এবং এক-চতুর্থ তারে তাহারি চারিগুণ ঢেউ উৎপন্ন করে। এই পরীক্ষায় তারটিকে মাঝে ছুঁইয়া অর্দ্ধেক করা হইয়াছে। কাজেই সমস্ত তারের কাঁপুনি হইতে আগে যতগুলি ঢেউ কানে ঠেকিতেছিল, এখন তাহারি দ্বিগুণ ঢেউ কানে ধাক্কা দিবে। অর্থাৎ আগে যদি তিন শত ঢেউ কানে ঠেকিয়া থাকে, এখন ঠেকিবে ছয় শত ঢেউ। কিন্তু ঢেউয়ের সংখ্যা বাড়িলেই শব্দ মিহি হয়। সুতরাং এখনকার শব্দ আগেকার শব্দের চেয়ে অনেক মিহি শুনাইবে।

আর একটা ছবি দেওয়া হইল। দেখ, সমস্ত তারের চারি ভাগের শেষে একটা পালক ছোঁয়াইয়া বাধা দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাতে ছড় টানা হইতেছে। ইহাতে সমস্ত তার চারিটি সমান ভাগে আপনিই ভাগ হইয়া কাঁপিতেছে। অর্থাৎ পূর্ব্বে সমস্ত তারের কাঁপুনিতে যদি সেকেণ্ডে তিন শত ঢেউ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এখন তাহারি চারি খণ্ডের প্রত্যেকটি কাঁপিয়া সেকেণ্ডে বারো শত করিয়া ঢেউ উৎপন্ন করিতে থাকিবে। সুর আরো মিহি শুনাইবে।
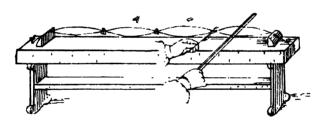
কোনো জায়গায় বাধা দিলে আপনা হইতেই তারের এই রকমে খণ্ড খণ্ড হইয়া যাওয়া এবং একের কাঁপুনিতে অন্য খণ্ডগুলির আপনা হইতেই কাঁপা, বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার। আমরা কেবল দুইটা উদাহরণ দিলাম। তোমরা সেতারের তারের এক-চতুর্থ এক-পঞ্চম ইত্যাদি জায়গায় বাধা দিয়া তারটিকে কাঁপাইয়ো। দেখিবে, তাহা চারিটি, পাঁচটি ইত্যাদি সমান ভাগে বিভক্ত হইয়া কাঁপিতেছে এবং যতই ভাগ বৃদ্ধি হইতেছে, ততই সুরও মিহি হইতেছে।

ছবিতে দেখ, তার যে-কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হইয়া

কাঁপিতেছে, তাহার প্রত্যেকটির মাঝখানটি ভয়ানক চঞ্চল। সেখানে একটু-একটু কাগজের চিপি দিয়া রাখা হইয়াছিল। তারের কাঁপুনিতে কাগজ ছিট্‌কাইয়া যাইতেছে। কিন্তু ঐ সকল ভাগের প্রান্তগুলি নিশ্চল আছে। তাই সে-সকল জায়গায় যে-কাগজের চিপি আছে, তাহা ছিট্‌কাইতেছে না। তারের এই নিশ্চল জায়গাগুলিকে বলা হয় গ্রন্থি।

তাহা হইলে দেখ, একটা তার সম্পূর্ণ কাঁপিয়া কেবল একটা সুর বাহির করিলেও তাহার বিশেষ বিশেষ জায়গা ছুঁইয়া ইচ্ছা মত মিহি সুর বাহির করা যাইতে পারে। এই রকম নানা সুর দিয়া গান ও গৎ বাজানো চলে। তোমরা হয় ত সেতার ও এস্‌রাজ দেখিয়াছ। এই যন্ত্রগুলিকে একবার ভালো করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখিবে, যন্ত্রের গায়ে তারের তলায় কতকগুলি লোহা বা পিতলের পরদা লাগানো আছে। সমস্ত তারটাকে ছোটো ছোটো ভাগে ভাগ করিয়া বাজাইবার জন্য ঐ ব্যবস্থা যন্ত্রে থাকে। যিনি ওস্তাদ্ তিনি লম্বা তারটিকে আঙুল দিয়া টিপিয়া পরদার গায়ে লাগাইয়া দেন্ এবং তাহার পরে তারটিকে কাঁপাইতে থাকেন। ইহাতে তারটি ছোটো ছোটো ভাগে বিভক্ত হইয়া কাঁপিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে মিহি সুর বাহির হইতে আরম্ভ করে। কোন্ পর্দায় তার টিপিয়া ধরিলে কি-রকম সুর বাহির হইবে, ওস্তাদেরা তাহা জানেন। কাজেই এই রকমে ইচ্ছামত মিহি ও মোটা সুর বাজাইয়া সঙ্গীত করা চলে।

বেণু-যন্ত্র

আগেই বলিয়াছি, শঙ্খ মুরলী ক্লারিয়োনেট্ বিগিল্, তোমাদের বাঁশের বাঁশী, সকলি বেণু যন্ত্র। আমাদের প্রাচীন পুঁথিপত্রে এগুলির নাম দেওয়া হইয়াছে শুষির-যন্ত্র। এগুলির আকৃতি নলের মতো এবং সেই সকল নলে বাতাস ভরা থাকে।

এ পর্য্যন্ত যে-সকল শব্দের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে তোমরা কোনো কঠিন জিনিষ কাঁপারই কথা শুনিয়াছ। বীণাযন্ত্রে তোমরা কি দেখিলে? দেখিলে, আঙুলের ঘায়ে যন্ত্রের তার এ-দিকে ও-দিকে নড়িয়া কাঁপে এবং সেই কাঁপুনিতে বাতাসে শব্দের ঢেউ উঠে। অর্থাৎ তারই কাঁপুনির সৃষ্টি করে, আর বাতাস তাহাই শব্দের ঢেউয়ের আকারে কানে পৌঁছিয়া দেয়। কিন্তু বেণু-যন্ত্রে ইহারি ঠিক উল্টা ব্যাপার দেখা যায়। এই সকল যন্ত্রের নলের ভিতরে যে বাতাসটুকু ভরা থাকে, তাহাই কাঁপে এবং সেই কাঁপুনিতে শব্দের ঢেউ বাহির হয়। অর্থাৎ এখানে বাঁশীর নল কাঁপে না, তাহার ভিতরে যে বাতাসটুকু থাকে তাহাই কাঁপে।

তাহা হইলে বুঝা যায়, যে-জিনিষ দিয়া বাঁশী প্রস্তুত করা গেল, তাহার উপরে প্রায়ই সুর নির্ভর করে না। বাঁশীর দৈর্ঘ্য অর্থাৎ তাঁহার ভিতরকার বাতাসের উচ্চতাই সুরকে মিহি

বা মোটা করিয়া খেলাইতে থাকে। একই মাপের একটা পেঁপের ডালের নলে এবং একটা কাচের নলে মুখ দিয়া আওয়াজ কর। দেখিবে, দুই নল হইতে একই সুর বাহির হইতেছে। একই মাপের কাঠের বাঁশী, বাঁশের বাঁশী, পিতলের বাঁশী, বা সীসার বাঁশীর আওয়াজে একটু-আধটু তফাৎ থাকে বটে, কিন্তু প্রত্যেকের মূল সুরটা কানে ঠিক্ এক রকমই শুনায়।

তোমরা বোধ হয় মনে কর, বাঁশীর নলের বাতাসে ফুঁ দিলেই বুঝি বাঁশী বাজে। কিন্তু তাহা নয়। যাহারা বাঁশী বাজায়, জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিবে বাঁশী বাজানোর কায়দা আছে। সাঁওতালেরা ও রাখালরা যে-বাঁশের বাঁশী বাজায়, তাহার মুখে ফুঁ দাও, দেখিবে ফুঁয়ের বাতাস নলের ভিতরে গিয়া তলার ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া গেল। ইহাতে বাঁশীর ভিতরকার বাতাস সংকুচিত ও প্রসারিত হইয়া শব্দের ঢেউ উৎপন্ন করিল না; বাঁশীও বাজিল না। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও এই রকম বাঁশী বাজাইতে পারি নাই। তাহা হইলে দেখ, বাঁশী হইতে আওয়াজ বাহির করিতে হইলে, তাহার ভিতরকার বাতাসকে কাঁপানো অর্থাৎ নিয়মিতভাবে সংকুচিত ও প্রসারিত করা দরকার। এই কাজটির জন্য বাঁশীর মুখের গড়ন নানা রকম থাকে।

আমরা ছেলেবেলায় যে এক পয়সা দামের বাঁশের বাঁশী বাজাইতাম, পর-পৃষ্ঠায় তাহারি মুখের ভিতরকার গড়নের একটা ছবি দিলাম। এই বাঁশী বাজানো শক্ত নয়, ফুঁ দিলেই বাজে।

তোমরা যখন ইহাতে ফুঁ দাও,তখন ফুঁয়ের বাতাস বাঁশীর নলের ভিতরে যায় না ; বাঁশার নীচে যে খাঁজের মতো ছিদ্র থাকে তাহা দিয়া উহা জোরে বাহির হয়। দেখ, ফুঁয়ের বাতাস বাহির হইবার পথটি কত সংকীর্ণ। একটা তিন-কোণা কাঠ লাগাইয়া পথটাকে সংকীর্ণ করা হইয়াছে। তাই যখন বাঁশীতে জোরে ফুঁ দেওয়া যায়, তখন ফুঁয়ের বাতাস সেই সরু পথ দিয়া বাহির হইবার সময়ে বাধা পায় ও কাঁপিতে আরম্ভ করে। তা'র পরে কি হয়, তাহা বোধ হয় তোমরা নিজেরাই বলিতে পারিবে। ছিদ্রপথের একটুখানি বাতাসের কাঁপুনিতে বাঁশীর নলের সব বাতাসই তালে তালে কাঁপিতে সুরু করে এবং ইহাতে যে-শব্দের ঢেউ হয়, তাহা কানে ঠেকিলে আওয়াজ শুনা যায়। কেবল বাঁশের বাঁশীতেই যে এই রকম সুর বাহির হয়, তাহা নয়। কয়েক রকম হুইসিল্ ক্লারিওনেট্ প্রভৃতি অনেক বিলাতি বাঁশীর মুখেও ঠিক ঐ রকমই ব্যবস্থা আছে এবং সেগুলির সুরও ঠিক ঐ-রকমে বাহির হয়।

দু-আনা দামের রং-চং করা টিনের বাঁশী তোমরা অনেক বাজাইয়াছ। দোলের মেলার সময়ে এই বাঁশী হাতে পাইলে যে কি আনন্দ হইত, তাহা আজো মনে আছে। আহার নাই, নিদ্রা নাই কেবল পোঁ-পোঁ শব্দে বাজানো চলিত। মা বিরক্ত হইতেন, কিন্তু তবুও বাঁশীর আওয়াজ বন্ধ হইত না। এই

বাঁশীর পরমায়ু বেশি দেখা যাইত না। দু'দিনেই তাহা ভাঙিয়া যাইত; বাড়ির লোকে হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিতেন। এই রকম ভাঙা বাঁশীর মুণ্ড তোমরা নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়াছ কি? আমরা অনেকবার উহার ভিতরকার গড়ন পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। তোমরাও পরীক্ষা করিয়ো, দেখিবে একটা খুব সরু পিতলের পাত একটা লম্বা ছিদ্রকে প্রায় ঢাকিয়া রহিয়াছে। কিন্তু পাতের দুই ধার আঁটা নয়। বাঁশের পাতলা বাতা বা বেতের সরু ছড়ির গোড়াটাকে হাতে ধরিয়া যেমন আগাকে লক্-লক্ করিয়া কাঁপানো যায়, ঐ পিতলের পাতের একটা মাত্র কিনারা আটকানো থাকে বলিয়া তাহা লক্-লক করিয়া কাঁপিতে পারে। পিতলের এই পাতলা পাতের ইংরেজি নাম রীড্। এখানে রীডের একটা খুব বড় ছবি দিলাম। দেখ, ছবিতে একটা সরু পিতলের পাতের এক দিক পেরেক দিয়া আটকানো। অন্য সকল দিক্ খোলা এবং আল্গা। চেহারাটা যেন আমাদের জিভের মতো। তোমাদের ভ্যাঁপু বাঁশীর মুখে ঠিক্ এই রকমই রীড্ লাগানো থাকে।

রীডের সাহায্যে কি রকমে বাঁশী বাজে এখন দেখা যাউক। মনে কর, একটা বাঁশী কিনিয়া তাহার মুখে ফুঁ দেওয়া গেল। ফুঁয়ের জোরে রীডের অবস্থা কি হইবে? তাহা কাঁপিতে থাকিবে এবং কাঁপুনির সঙ্গে তাহার নীচেকার ছিদ্রটাকে একবার খুলিবে এবং একবার

বন্ধ করিবে। কাজেই তুমি ফুঁয়ের সঙ্গে যে বাতাস বাঁশীর ভিতরে চালাইলে, তাহা থামিয়া-থামিয়া তালে-তালে ছিদ্রপথ দিয়া বাহির হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে একটা কাঁপুনির সৃষ্টি করিতে থাকিবে। তার পরে কি হইবে, বলা কঠিন নয়। বাঁশীর নলের বাতাস ঐ কাঁপুনিতে তালে-তালে কাঁপিয়া শব্দের ঢেউ উৎপন্ন করিবে এবং সেই ঢেউ যখন তোমার আমার এবং আরো দশ জন লোকের কানে ধাক্কা দিবে, তখন সকলেই ভ্যাঁপুঁর আওয়াজ শুনিবে।

তোমরা ইহা শুনিয়া মনে করিও না,যেন টিনের ভ্যাঁপুঁতেই রীড্ লাগানো থাকে। শানাইয়ে ক্লারিয়োনেটে এবং বয়-স্কাউটদের কনসার্টিনা বাঁশীতেও রীড্ আছে। তোমরা দেওয়ালে আম-পুঁয়ে ঘসিয়া যে-বাঁশী তৈয়ারি কর, তাহাকেও রীডের বাঁশী বলা যায়। ক্লারিয়োনেটের রীড্ পিতলের নয়; বাঁশের পাতলা চেয়াড়ি দিয়া তাহা তৈয়ারি করা হয়। আম-পুঁয়ে বাঁশীর মুখেও পিতলের রীড্ থাকে না। দেওয়ালে ঘসিলে উহার মুখের কাছের শাঁস ক্ষয় পাইয়া কাগজের মতো পাত্লা হয়। তাহাই যখন ফুঁয়ের জোরে ঘন ঘন কাঁপে তখনি বাঁশী হইতে আওয়াজ বাহির হয়। হারমোনিয়ম্ খুলিয়া পরীক্ষা করিলে দেখিবে তাহাতে অনেক রীড্ লাগানো আছে। ফুঁয়ের জোরে হারমোনিয়ম্ বাজে না। বেলোজ্ অর্থাৎ হাফরের বাতাস রীড্‌কে কাঁপাইয়া সুর বাহির করে।

আড়-বাঁশী তোমরা দেখিয়াছ কি? এই বাঁশীর মুখে রীড্ বা অন্য কিছু থাকে না। আড়-ভাবে মুখে ধরিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া ফুঁ দিলে ইহা হইতে শব্দ বাহির হয়। রাখাল বালকেরা ও সাঁওতালেরা আড-বাঁশী বাজায়। শ্রীকৃষ্ণের মুরলীও আড়-বাঁশীর উদাহরণ। এই বাঁশী বাজানো কঠিন। ইহাতে বাদকের উপর ও নীচের ওষ্ঠই রীডের কাজ করে। অর্থাৎ রীড্ নিজে কাঁপিয়া যেমন বাতাসকে কাঁপায়, এখানে ওষ্ঠ কাঁপিয়া বাঁশীর ভিতরকার বাতাসে সেই রকমে শব্দের ঢেউ তোলে। কর্ণেট বিগিল্ এবং মহাদেবের শিঙাকেও এই শ্রেণীর বাঁশী বলা যাইতে পারে।

বীণা-যন্ত্রের কথা তোমাদিগকে বলিয়াছি। তাহার প্রত্যেক তার কাঁপিয়া এক-একটা মূল সুর উৎপন্ন করে এবং তারটিকে পরদায় ছোঁয়াইয়া বাজাইলে নানা রকম মিহি সুর বাহির হয়। বাঁশীতেও নলের ভিতরকার বাতাস সাধারণত একটা সুরই বাহির করে। কিন্তু নানা উপায়ে একই বাঁশী হইতে নানা সুর বাহির করা চলে এবং চলে বলিয়াই বাঁশীতে গান বাজানো ও গৎ বাজানো যায়। সেই উপায়গুলির আভাস তোমাদিগকে সংক্ষেপে দিব।

চেয়ারের ও কৌচের গদিতে যে লোহার স্প্রিং লাগানো থাকে, তাহা বোধ করি তোমরা দেখিয়াছ। গদির উপরে বসিলে দেহের চাপে স্প্রিং সংকুচিত হইয়া যায় এবং উঠিয়া দাঁড়াইলেই তাহা প্রসারিত হইয়া আবার পূর্ব্বের আকার ফিরিয়া

পায়। এই জন্য স্প্রিং-এর উপরে বসায় আরাম আছে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, বাঁশীর নলের ভিতরে যে বাতাস থাকে, তাহা লম্বালম্বি-ভাবে স্প্রিং-এর মতো একবার সংকুচিত এবং একবার প্রসারিত হয়। ইহাই বাঁশীর বাতাসের কাঁপুনি। ইহাই বাহিরের বাতাস কাঁপাইয়া শব্দের ঢেউ উৎপন্ন করে এবং সেই সকল ঢেউ যখন কানে ধাক্কা দেয়, তখন আমরা শব্দ শুনি।

মনে কর, একটা বাঁশী লইয়া পরীক্ষা করা যাইতেছে। তোমরা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছ, আমরা সাধারণত দুই রকমে বাঁশী দেখিতে পাই। এক রকম বাঁশীর নলের তলা খোলা থাকে। শানাই, কর্ণেট, ক্লারিয়োনেট্ প্রভৃতিতে তোমরা ইহাই দেখিতে পাইবে। এক পয়সা দামের বাঁশের বাঁশীর কিন্তু তলা প্রায়ই খোলা থাকে না। ইহা তলা-বন্ধ বাঁশী। তলা-খোলা বাঁশী পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, ইহার ভিতরকার বাতাস যখন কাঁপে, তখন নলের ঠিক্ মাঝামাঝি জায়গায় কাঁপুনি থাকে না—কাঁপুনি থাকে বেশি মুখে ও পিছনের ফাঁকে। তারের কাঁপুনিতেও তোমরা ইহা দেখিয়াছ। কাঠি বা আঙুল ছোঁয়াইয়া লম্বা তারকে ছোটো করিয়া বাজাইলে ছোঁয়া জায়গায় কাঁপুনি থাকে না। তারের সেই অচঞ্চল জায়গার নাম দিয়াছিলাম গ্রন্থি। তলা-খোলা বাঁশীর বাতাসেরও ঠিক্ মাঝা-মাঝি জায়গায় গ্রন্থি থাকে, অর্থাৎ সেখানকার বাতাস অচঞ্চল দেখা যায়। তাহা হইলে দেখ, এই বাঁশার বাতাস যেন দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া কাঁপে। ইহাতে যে-সুর হয় তাহাই

বাঁশীর মূল সুর। ভ্যাঁপু বাঁশী বা তাল-পাতার বাঁশী বাজাইলে আমরা ঐ মূল সুরটাই শুনিতে পাই। বাঁশীর দৈর্ঘ্য অর্থাৎ ভিতরকার বাতাসের দৈর্ঘ্য অনুসারে উহা মিহি বা মোটা হয়। যদি একই রকমের দুইটা বাঁশী লইয়া তোমরা বাজাইতে থাকো, তবেই একের মূল সুর অন্যের মূল সুরের সহিত মিলিবে। দৈর্ঘ্যে এক না হইলে কখনই সুরে সুরে মিল হইবে না।

তাহা হইলে দেখা গেল, প্রত্যেক বাঁশী হইতে কেবল একটা করিয়া মূল সুর বাহির হয়। কিন্তু একটা সুরে সঙ্গীত হয় না। হুইসিলে, শঙ্খে সাধারণত একটা সুরই বাজে। তাই শঙ্খে সঙ্গীত হয় না; হুইসিলেও গান বাজানো যায় না। তবে একটা বাঁশী হইতে নানা সুর বাহির করিয়া কি-রকমে গান বাজানো যায়? বাঁশীটাকে ক্ষণে ক্ষণে লম্বা ও খাটো করিতে পারিলে, তবেই তাহা হইতে নানা সুর বাহির হয়। একটা তারকে ইচ্ছামত লম্বা ও খাটো করা সহজ। আঙুল বা অন্য কিছু দিয়া ছুঁইলেই তার খাটো করার ফল হয় এবং আঙুল উঠাইয়া লইলে তাহাকে লম্বা করার কাজ চলে। তাই নানা জায়গায় ছুঁইয়া একই তার হইতে নানা সুর বাহির করা যায়। গান বাজাইবার সময়ে বাঁশীকেও প্রকারান্তরে লম্বা ও খাটো করা হয়। কিন্তু কি করিয়া হয়, তাহা বোধ হয় তোমরা জানো না। বাঁশীর গায়ে যে-সব ছিদ্র থাকে, তাহাই উহাকে লম্বা ও খাটো করার কাজ করে।

তোমরা আগেই শুনিয়াছ, বাজাইবার সময়ে বাঁশীর তলা ও উপর বাহিরের বাতাসের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, তাই সেখানকার বাতাস খুব চঞ্চল হয়। আর নিশ্চল থাকে, বাঁশীর ঠিক্ মাঝের বাতাসটুকু।

মনে কর, কোনো বাঁশীর গায়ে সাতটি ছিদ্র আছে। আমরা যেন আঙুলের চাপে সব ছিদ্র বন্ধ করিয়া কেবল একটি ছিদ্র খুলিয়া বাঁশী বাজাইলাম। খোলা ছিদ্রটির সঙ্গে বাহিরের বাতাসের যোগ আছে। কাজেই লম্বা বাঁশীটির যে-অংশটুকু ছিদ্রে আসিয়া শেষ হইয়াছে, তাহারি ভিতরকার বাতাস কাঁপিয়া শব্দ উৎপন্ন করিবে। অর্থাৎ খাটো বাঁশী বাজাইলে যে-সুর বাহির হয়, এখানে ঠিক্ সেই রকম সুরই শুনা যাইবে। এই রকমে কাছের বা দূরের ছিদ্রকে প্রয়োজন মতে খুলিয়া বা বন্ধ করিয়া বাঁশীকে খাটো বা লম্বা করিলে যে-সকল সুর বাহির হয়, সেই সকল সুর অনায়াসে উৎপন্ন করা যায়। তাহা হইলে দেখ, বাঁশীর গায়ের ছিদ্রগুলি অকেজো জিনিষ নয়। উহাই বাঁশীর নলকে খাটো এবং লম্বা করার কাজ করে।

পটহ ও কাংস্য-যন্ত্র

তোমরা আগেই শুনিয়াছ, পাতলা চামড়ার কাঁপুনিতে যে সব যন্ত্র হইতে শব্দ বাহির হয়, তাহা পটহ-যন্ত্র। ঢাক ঢোল বাঁওয়া তবলা মৃদঙ্গ প্রভৃতি চামড়া কাঁপাইয়া শব্দ বাহির করে। তাই এগুলিকে পটহ-যন্ত্র বলিতে হয়। আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা এই প্রকার যন্ত্রের নাম দিয়াছেন, আনদ্ধ। ঢাকের শব্দ তোমাদের মিষ্টি লাগে কি? খুব ওস্তাদ ঢাকীরা সত্যই মিষ্ট করিয়া ঢাক বাজাইতে পারে। তাহাতে নানা তাল-মান থাকে এবং শব্দটাও কখনো মিহি এবং কখনো মোটা হয়।

চড়কের ঢাকের শব্দ ভয়ানক কড়া। এই সময়ে প্রচণ্ড রৌদ্রে ঢাকের চামড়া শুকাইয়া কড়-কড় করে। ইহাতে চামড়ায় টান ধরে। কাজেই শব্দ কড়া হয়। তার পরে বর্ষাকালে দশহরার দিনে যে ঢাক-ঢোল বাজে তাহা যেন ঢ্যাব্-ঢ্যাব্ করে। বৃষ্টির জলে ভিজিয়া গেলে, ঢাকের চামড়ায় আর সে-রকম টান থাকে না। ইহাতে তাহা ধীরে কাঁপে, তাই শব্দটা হয় বড় মোটা। পটহ-যন্ত্রের চামড়াকে টানিয়া রাখার জন্য যে ব্যবস্থা আছে, তাহা তোমরা দেখ নাই কি? অনেকগুলি চামড়ার দড়ি, ঢাকের চাকের সঙ্গে লাগানো থাকে। সেগুলিকে

টানিলে চামড়ায় টান পড়ে, তখন তাহা হইতে মিহি সুর বাহির হয়। আবার দড়িতে ঢিল দিলে চামড়া আল্‌গা হয়। তখন আওয়াজ হয় মোটা। তবলা বাজাইবার সময়ে দড়ির গুলিতে হাতুড়ি ঠুকিতে হয়। ইহাতে দড়ির টান কম-বেশী হয়, এবং তবলার সুরে মিহি-মোটা খেলে। পটহ-যন্ত্রের মোটামুটি নিয়ম এই যে, চামড়াটা যত ছোটো এবং চামড়ায় যত বেশী টান পড়ে, শব্দও তত মিহি হয়।

কাঁসর-ঘণ্টা, পেটা-ঘড়ি, কাঁসি, ইহাদের সকলকেই কাংস্য যন্ত্রের উদাহরণ বলা যাইতে পারে। আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতেরা এই যন্ত্রকে বলিতেন অক-যন্ত্র। কাঁসির আয়তন ছোটো তাই বাজাইলে কাঁই-কাঁই শব্দ করে। কাঁসর বেশ লম্বা-চৌড়া জিনিষ, তাই তাহার ঘঙ্‌-ঘঙ্‌ শব্দ হয়। বড় ঘণ্টার চেয়ে ছোটো ঘণ্টার শব্দ মিহি। এই সব দেখিলেই বুঝা যায়, কাংস্য-যন্ত্র যত ছোটো ও খাটো হয়, তাহার শব্দও তত মিহি হয়।

এক রকম যন্ত্রে কতকগুলি ছোটো-বড় কাচ বা ধাতুর ফলক কাঠের ফ্রেমের ফিতার উপরে সাজানো থাকে। কাঠের ছোটো মুগুর দিয়া ঘা দিলে সেগুলি হইতে টুং-টাং সুর বাহির হয়। এই সুরে গৎ বা গান বাজানো চলে। তোমরা এ-রকম যন্ত্র দেখ নাই কি? ইহাকে ইংরেজীতে হারমোনিকম্‌ বলে। আমরা ছেলেবেলায় ইহা কিনিয়া অনেক খেলা করিয়াছি। যন্ত্রে যে-সকল ফলক লাগানো থাকে, তাহাদের

মধ্যে কতকগুলি বড় এবং আর কতকগুলি ছোটো। বড় ফলক হইতে মোটা এবং ছোটো ফলক হইতে মিহি সুর বাহির হয়। এই মিহি ও মোটা সুর দিয়া গান বাজানো চলে।

তোমরা জল-তরঙ্গ বাজনা শুনিয়াছ কি? কতকগুলি ছোটো-বড় চীনা-মাটির পেয়ালায় একটু-একটু জল রাখিয়া কাঠি দিয়া পেয়ালাগুলিকে যেমন বাজানো যায়, অমনি টুং-টাং করিয়া মিহি-মোটা সুর বাহির হয়। সুরগুলি কিন্তু বেশ মিষ্টি লাগে। ওস্তাদরা এই সব সুরে সুন্দর গৎ ও গান বাজাইতে পারেন। পেয়ালার যে-অংশ জলে ভরা থাকে, ঘা পাইলে তাহা কাঁপে না, যেটুকু জলের উপরে জাগিয়া থাকে কেবল তাহাই কাঁপে। তাই পরিমাণ-মতো জল ঢালিয়া পেয়ালাগুলি হইতে মিহি বা মোটা যে-রকম ইচ্ছা সুর বাহির করা যাইতে পারে। যেমন ঘণ্টা হইতে আওয়াজ বাহির হয়, তেমনি চীনা-মাটির পেয়ালা হইতে সুরের উৎপত্তি হয়। সুতরাং জলতরঙ্গকে এক রকম কাংস্য-যন্ত্রই বলিতে হয়।

বীণাযন্ত্রের তার নানা রকমে খণ্ড খণ্ড হইয়া বাজে, তাহা তোমরা আগেই দেখিয়াছ। বেণু-যন্ত্রের ভিতরকার বাতাসও যে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া কাঁপে তাহাও বলিয়াছি। কাংস্য-যন্ত্রেও তাহাই দেখা যায়। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ইহাকে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ হইয়া কাঁপিতে দেখা যায়।

পর-পৃষ্ঠায় একটা ছবি দিলাম। দেখ, একটা পিতলের চৌকাণা ফলক খোঁটার উপরে দাঁড়াইয়া আছে এবং

ফলকটিকে বেহালার ছড় দিয়া কাঁপানো হইতেছে। ফলকের উপরে বালি ছড়ানো আছে। ফলকের কাঁপুনিতে বালিগুলি কি-রকম আকৃতি পাইয়াছে, তাহা তোমরা ছবিতে দেখিতে পাইবে। কোনো জায়গায় টিপিয়া ধরিলে

লোহার বা পিতলের তার যেমন খণ্ড খণ্ড হইয়া কাঁপে, ধাতু ফলকটিও সেই রকমে খণ্ডিত হইয়া কাঁপিতেছে। তাই উহার যে-জায়গায় কাঁপুনি বেশি সেখানে বালি দাঁড়াইতে পারিতেছে না; যেখানে কাঁপুনি অল্প সেইখানেই বালি দাঁড়াইয়া আছে। তাহা হইলে দেখ, বীণা-যন্ত্রের তারে এবং বেণু-যন্ত্রের ভিতরকার বাতাসে যেমন গ্রন্থি অর্থাৎ অচঞ্চল জায়গা থাকে, ধাতু-ফলকেও তাহাই দেখা যাইতেছে। কেবল ধাতু-ফলক নয়, ঘণ্টাতে যখন ঘা মারা যায় তখন তাহাও গ্রন্থির দ্বারা বিভক্ত হইয়া খণ্ডে খণ্ডে কাঁপে।

সুর-সপ্তক

রকম-রকম শব্দের মধ্যে কোন্‌গুলি মিহি এবং কোন্‌-গুলিই বা মোটা তাহা শুনিলেই বুঝা যায়। এ-সম্বন্ধে অনেক কথা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। তা ছাড়া নানা শব্দের মধ্যে কোন্‌গুলিকে সুর এবং কোন্‌গুলিকেই বা কোলাহল বলি, তাহাও তোমরা বুঝিয়াছ। কানে শুনিয়া শব্দের এই সব তফাৎ ধরা যায়। এখানে সুর-সম্বন্ধে আরো কতকগুলি কথা বলিব।

যিনি কালোয়াৎ তিনি গলা হইতে, সা রে গা মা পা ধা নি, এই সাতটা সুর বাহির করেন। যিনি বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে পারেন, তিনি হার্‌মোনিয়মের চাবি টিপিয়া বা সেতারের পরদায় তার ঠেকাইয়া ঐ সাতটা সুর অনায়াসে শুনাইতে পারেন। তোমরা ইহা শুন নাই কি? শুনিলেই বুঝা যায়, সাতটা সুরের মধ্যে, "সা" সব চেয়ে মোটা, তার চেয়ে মিহি "রে", তা'র চেয়েও মিহি "গা", ইত্যাদি। অর্থাৎ সেকেণ্ডে যতগুলি শব্দের ঢেউ কানে লাগিয়া আমাদিগকে "সা" সুর শুনায়, "রে" সুরের ঢেউয়ের সংখ্যা তা'র চেয়ে বেশি, "গা" সুরের আরো বেশি, "মা" সুরের তা'র চেয়েও বেশি, ইত্যাদি। "সা" হইতে "নি" পর্য্যন্ত সাতটা সুরকে সপ্তক বলা

হয়। যাঁহাদের কান দুরস্ত আছে, তাঁহারা কোনো সপ্তকের যে-কোন সুর শুনিলে, তাহা সা রে গা ইত্যাদির মধ্যে কোন্‌টি চট্‌ করিয়া বলিতে পারেন।

তোমরা বোধ হয় মনে করিতেছ, 'সা' সুরের চেয়ে একটু মিহি সুর বাহির করিলেই বুঝি তাহা 'রে' হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু তাহা নয়। "রে" নিশ্চয়ই "সা" সুরের চেয়ে মিহি। কিন্তু কতটা মিহি তাহার একটা পরিমাণ ঠিক করা আছে। সেই পরিমাণের একটু এদিক্‌-ওদিক্‌ হইলে, তাহা আর 'রে' সুর হয় না। ওস্তাদেরা কানে শুনিয়া ইহা বুঝিতে পারেন, বৈজ্ঞানিকেরা কাঁপুনির সংখ্যা মিলাইয়া তাহা জানিতে পারেন। কোনো সপ্তকের কতগুলি কাঁপুনিতে 'রে' তান, কতগুলিতে 'গা' তান এবং কতগুলিতেই বা 'মা' হইল, তাহা ধরা-বাঁধা আছে।. ইহা গুণা যায় এবং গুণিয়া হিসাব করা চলে।

একটা সহজ হিসাবের কথা বলি। মনে কর, সেকেণ্ডে চব্বিশটা কাঁপুনি অর্থাৎ শব্দের ঢেউ কানে গেলে যেন আমরা কোন সপ্তকের 'সা' সুরটি শুনিলাম। বৈজ্ঞানিকেরা দেখিয়াছেন, সেই কাঁপুনি বাড়িয়া সাতাইশটি হইয়া না দাঁড়াইলে আমরা "রে" সুরটি শুনিব না। যদি সাতাইশের বদলে ছাব্বিশটি কানে যায়, তবে সুর মিহি হয় বটে, কিন্তু তাহা 'রে' হয় না, একটা বেসুরো ধ্বনি হইয়া পড়ে। তাহা শুনিতে ভালো লাগে না। যাঁহারা গান-বাজনা করেন,

তাঁহারা সেই বদ্‌সুর সহ্য করিতে পারেন না; শুনিলে কানে আঙুল দেন।

তাহা হইলে দেখা গেল, 'সা' এর কাঁপুনির সংখ্যার সহিত 'রে' এর কাঁপুনি-সংখ্যার একটা ধরা-বাঁধা সম্বন্ধ আছে। অর্থাৎ 'সা'এ যদি হয় চব্বিশ কাঁপুনি, তবে 'রে'তে হইবে সাতাইশ কাঁপুনি। প্রকারান্তরে বলা যায়, যদি 'সা' এ থাকে একটা মাত্র কাঁপুনি, তবে 'রে' এ থাকিবে ১ ১/৮ কাঁপুনি।

আমরা কেবল সপ্তকের "সা" ও "রে"এর কাঁপুনির তুলনা করিলাম। রে গা, গা মা, মা পা, পা ধা, এবং ধা নি, ইত্যাদিকে তুলনা করিলেও ঐ প্রকারেরই এক-একটা বিশেষ সম্বন্ধ পাওয়া যায়।

'সা'-এর কাঁপুনিকে চব্বিশ ধরিলে সপ্তকের অন্যান্য সুরের কাঁপুনির সংখ্যা কত হয়, নীচে তাহার একটা তালিকা দিলাম,—

সা	রে	গা	মা	পা	ধা	নি
২৪	২৭	৩০	৩২	৩৬	৪০	৪৫

অথবা একটা মাত্র কাঁপুনিতে যদি "সা" সুর শুনা যায় তবে—

সা	রে	গা	মা	পা	ধা	নি
						১৫/৮

কিন্তু সেকেণ্ডে অন্তত ত্রিশটা করিয়া শব্দের ঢেউ কানে ধাক্কা না দিলে সুর শুনা যায় না। সুতরাং তালিকার চব্বিশটা ঢেউয়ে বা একটা ঢেউয়ে কখনই 'সা' সুর বাহির হয় না।

সপ্তকের সাতটি স্বরের কাঁপুনির মধ্যেকার সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্যই তালিকার 'সা' এর কাঁপুনিকে চব্বিশ এবং এক ধরিয়া দুইটা তালিকা প্রস্তুত করা হইল।

যাঁহারা হার্‌মোনিয়াম্ পিয়ানো বা অন্য কোনো বিলাতি বাঁধা-যন্ত্র বাজান, তাঁহাদের এক একটি সপ্তক ঠিক থাকে। কেহ সি-সপ্তকে বাজাইয়া থাকেন, কেহ বা 'ডি'-সপ্তকে স্বর বাহির করেন। কিন্তু 'সি'-সপ্তকেরই চলতি বেশি। 'সি'-সপ্তকের সা স্বরটি শুনা যায়, সেকেণ্ডে ২৫৬-টি কাঁপুনিতে। সুতরাং আগেকার সম্বন্ধ-অনুসারে ঐ সপ্তকের রে গা মা পা ইত্যাদিতে যে কতগুলি করিয়া কাঁপুনি আছে, তাহা বলা কঠিন নয়।

সেই হিসাবে 'সি'-সপ্তকের সাতটি স্বরের কাপুনি-সংখ্যা হয়,—

সা	রে	গা	মা	পা	ধা	নি
২৫৬	২৮৮	৩২০	৩৪১	৩৮৪	৪২৭	৪৮০

তাহা হইলে 'সি'-সপ্তকের সা রে গা মা ইত্যাদি স্বর প্রকৃতই কত কাঁপুনিতে শুনা যায় তাহা জানা গেল। ইহার সঙ্গে আবার কড়ি ও কোমল স্বর আছে। সেগুলি লইয়া কেবল ওস্তাদেরা ও গায়কেরা নাড়াচাড়া করেন, তাই তাহাদের কথা এখানে তোমাদের বলিলাম না।

সেকেণ্ডে ২৫৬ কাঁপুনিতে "সা" স্বর হয় এবং ২৮৮ কাঁপুনিতে রে স্বর শুনা যায়। এই রকমে সা ও রে স্বর গলা হইতে

একে-একে বাহির করিলে বেশ ভালো শুনায়। কিন্তু ২৫৬ এবং ২৮৮ কাঁপুনির মাঝামাঝি কোনো কাঁপুনি হইতে যে-সুর হয়, তাহা সা বা রে কোনোটারই সঙ্গে খাপ খায় না। পর পর বাজাইলে বেসুরা শুনায়।

সপ্তকের সাতটা স্বরের এই যে প্রীতিকর ভাব কেমন করিয়া হয়, তাহা ঠিক বলা যায় না। বড় বড় পণ্ডিত এ-সম্বন্ধে নানা পরীক্ষা করিয়াছেন; কিন্তু কিছুই ঠিক্ করিতে পারেন নাই। কেহ কেহ বলেন, মানুষ যেমন সভ্য হইতেছে, তেমনি ঐ ভাবটি মনে আসিতেছে। হয়ত অনেক দিন পরে এমন সময় আসিবে যখন সপ্তকের সুরগুলির মধ্যেকার এখনকার তফাৎ আমাদের কানে ভালো লাগিবে না। তখন সপ্তককে ভাঙিয়া নূতন করিয়া গড়িতে হইবে।

সুরের মিল

এক-একখানি ছবি কেমন সুন্দর! তাহাতে অনেক রঙ্ দেওয়া থাকে। কোথাও সবুজ, কোথাও হল্‌দে, কোথাও নীল, কোথাও লাল, কোথাও লাল নীল সবুজ নানা রঙের রেশ। আবার কোনো রঙ্ উজ্জ্বল এবং কোনো রঙ ম্লান। আরো দেখিবে, ভালো ছবিতে লাল রঙের ঠিক্ কাছে নীল থাকে না। নিপুণ চিত্র-শিল্পী ছবিতে রঙগুলির এমন যোজনা করেন যে, তাহার দিকে তাকাইলে চোখে ক্লান্তি আসে না। হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠে। কেবল চিত্রকরই যে এই রকমে রঙ্ যোজনা করেন, তাহা নয়। সকলের চেয়ে বড় শিল্পী নিয়তই বিশ্বে যে রঙের খেলা দেখাইতেছেন, তাহার মধ্যেও আশ্চর্য্য রঙের যোজনা দেখা যায়। ঘাসে পাতায় ফুলে ফলে আকাশে মেঘে যে-রঙের খেলা দেখা যায়, তাহাতে একটুও ভুলচুক্ থাকে না। যেখানে যে-রঙটি লাগাইলে চোখের তৃপ্তি হয়, আপনা হইতে সেখানে ঠিক্ সেই রঙটি ফুটিয়া উঠে। ওস্তাদ গায়ক যে এক-একখানি গান গাহিয়া আমাদের মোহিত করেন, তাহাও যেন এক-এক-খানি নানা রঙের ছবি। গানের ছবিতে রঙ নাই এবং রঙের যোজনাও নাই। তাহাতে আছে কেবল সুর ও সুরের যোজনা। চিত্রকর যেমন এক রঙের পাশে লাগ সই অন্য রঙ বসাইয়া

ছবিগুলিকে মনোরম করেন, গায়কও ঠিক্ সেই রকমে এক সুরের পরে আর একটা সুর লাগাইয়া গানকে মধুর করেন। সুরের যোজনাই গানের প্রাণ। তাই তোমাদিগকে এখানে সুর-যোজনার কথা একটু বলিব।

গানের আসর বসিয়াছে। তানপুরা বাজিতেছে, হারমোনিয়মের সুর শুনা যাইতেছে, তবলার চাঁটির শব্দ মাঝে মাঝে কানে আসিতেছে। এই সময়ে সব যন্ত্রের সুরে একটা আশ্চর্য্য মিল থাকে। তানপুরার সহিত হারমোনিয়মের মিল, হারমোনিয়মের সঙ্গে আবার তবলার মিল। সুরে সুরে আসর গম্‌গম্ করে। গায়ক যখন গান ধরেন, তখন ঐ সুরে গলার সুর মিলাইয়া লন্। রঙে রঙে মিল রাখা যেমন চিত্রকরের কায়দা, তেমনি সুরে সুরে মিল রাখা গায়কের ওস্তাদি।

দুই তারের বা দুই যন্ত্রের সুরের কাঁপুনির সংখ্যা যদি একই হয়, তাহা হইলে দুইটি সুর মিলিয়া যায়। মনে কর, আমার গলা হইতে সেকেণ্ডে ৩২০-টা শব্দের ঢেউ বাহির হইয়া যেন তোমার কানে প্রবেশ করিল। আবার এস্‌রাজের কোনো একটা তার কাঁপিয়া তোমার কানে সেকেণ্ডে ৩২০-টা ঢেউ ফেলিতে লাগিল। এই দুইটি সুরকে তুমি অবিকল এক সুরই শুনিবে। ইহাই সুরের বেমালুম মিল। কিন্তু অনেক বাদ্যযন্ত্রের সুরে যদি একের ঢেউয়ের সংখ্যা অন্যের তুলনায় ২, ৩, ৪, ৫ ইত্যাদি গুণ বেশি হয়, তাহাতেও সুরে সুরে মিল ঘটে। কিন্তু ইহাকে বেমালুম মিল বলা যায় না। মনে কর, আমার গলা হইতে সেকেণ্ডে ৩২০

কাঁপুনির ঢেউ বাহির হইতেছে এবং হারমোনিয়ম্ হইতে তাহারি তিন গুণ অর্থাৎ ৯৬০ ঢেউ বাহির হইতেছে। এখানে আমার মোটা সুরে ও হারমোনিয়মের মিহি আওয়াজে মিল হইবে বটে, কিন্তু বেমালুম মিল ঘটিবে না। দুইয়ের মধ্যে যে একটা মোটা এবং আর একটা মিহি তাহা বুঝা যাইবে।

ইহা ছাড়া সুরের মিলনের আরো নিয়ম আছে। দুই সুরের ঢেউয়ের সংখ্যার অনুপাত যদি ৩/২, ৮/৫, ৫/৪ হয়, তাহা হইলেও সুরের আর এক রকমের মিল হয়। সা পা, সা গা, রে ধা, প্রভৃতিতে যে মিল দেখা যায়, তাহা এই প্রকারেরই মিল। কিন্তু দুই সুরের অনুপাত যদি হইয়া দাঁড়ায় ১৬/১৫, ৯/৮, বা ১৫/৮, তখন সুরে সুরে আর মিল শুনা যায় না। এই রকম সুর বাজাইলে শব্দ কর্কশ হয়। তখন তাহা কোলাহল হইয়া দাঁড়ায়। হারমোনিয়মের সা ও রে এই দুই পরদা এক সঙ্গে বাজাইয়া দেখিয়ো। এখানে সুরে সুরে মিল হইবে না। দুই সুরে একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিবে। পা ও সা এই দুই সুরের কাঁপুনির অনুপাত ৩/২। হারমোনিয়মের এই দুইটি পরদা এক সঙ্গে টিপিয়া বাজাইয়ো, দেখিবে এখানে সুরে সুরে মিল হইয়াছে। আবার সা গা পা, এই তিনটি পর্দা এক সঙ্গে টিপিয়া বাজাও, দেখিবে এখানেও একরকম মিল আছে। সুরের এই রকম মিলন আমাদের সঙ্গীত-শাস্ত্রে বেশি ব্যবহার করা হয় না। য়ুরোপে ইহার খুবই ব্যবহার আছে। ইহাই বিলাতি সঙ্গীতের প্রধান কায়দা।

সুর-মিশ্রণ

বেহালা সারঙ্গী হারমোনিয়ম্ পিয়ানো প্রভৃতির একটা সুরকে একে একে বাজাইলে, তাহা কানে ভিন্ন ভিন্ন রকম শুনায়। মনে কর, ২৫৬ কাঁপুনিতে যে "সা" সুরটি হয়, তাহাকে একবার বেহালায়, একবার হারমোনিয়মে এবং আর একবার এস্‌রাজে বাজানো গেল। এই তিন সুর কি একই রকম শুনাইবে? ক নই শুনাইবে না। তুমি চোখ বুঁজিয়া বলিয়া দিতে পারিবে, কোন্ সুরটা বেহালা, কোন্‌টা হারমোনিয়ম্, এবং কোন্‌টা এস্‌রাজ হইতে বাহির হইতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সুরের প্রবলতা ও কম্পন-সংখ্যা এক হইলেও নানা যন্ত্রে তাহা নানা রকম শুনায়। তাই যখন কন্‌সার্টে ক্লারিওনেট্, বেহালা, হার্মোনিয়ম্, কর্ণেট প্রভৃতি যন্ত্র একই সপ্তকের একই সুরে ঝঙ্কার দিয়া উঠে, তখন ঝঙ্কারের কোন্ সুরটা কোন্ যন্ত্রের তাহা চেনা যায়। বেহালা ও এস্‌রাজের সুর যেন কতকটা মানুষের গলার সুরের মতো। সারঙ্গীর সুর যেন কতকটা নাকি ধরণের। কিন্তু কর্ণেটের ও ক্লারিওনেটের সুরের সঙ্গে মানুষের গলার ভাব একটুও মিলে না। কম্পন-সংখ্যা এক, এবং প্রবলতাও এক,—তবুও একটা যন্ত্রের আওয়াজ আর একটা যন্ত্রের তুলনায় পৃথক্ শুনায় কেন?

ইহার উত্তর বৈজ্ঞানিকেরা দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, কোনো যন্ত্রে ঠিক্ খাঁটি সুর পাওয়া কঠিন। যন্ত্র বাজাইলেই খাঁটি সুরের সঙ্গে অনেক মিহি সুর জড়াইয়া যায় এবং ইহাতে সুরটাকে একটু ভিন্ন রকম করিয়া তুলে। একটা উদাহরণ লওয়া যাউক। মনে কর, তুমি এস্‌রাজে ছড় টানিয়া তাহার মূল সুরটি বাজাইলে। ধরা যাউক, ইহাতে যেন সেকেণ্ডে ২৫৬-টা করিয়া শব্দের ঢেউ কানে আসিয়া ঠেকিতে লাগিল। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, যখন তুমি সমস্ত তারটা কাঁপাইয়া মূল সুর বাহির করিলে, তখন সেই সুরের দ্বিগুণ তিন-গুণ কাঁপুনি-ওয়ালা মিহি সুরও তাহার সহিত মিশিয়া পড়ে। কি প্রকারে মিশিয়া পড়ে? যখন তুমি মুল সুর বাহির করিবার জন্য সমস্ত তারটিকে কাঁপাও, তখন সেই তারটিই আপনা হইতে অর্দ্ধেক এক-তৃতীয় এক-চতুর্থ ইত্যাদি খাটো অংশে বিভক্ত হইয়া উঁচু সপ্তকের মিহি সুর বাহির করে এবং সেই সুরগুলি মূল সুরের সহিত মিশিয়া যায়। ইহাতেই সুরটিকে ভিন্ন রকম শুনায়। আমরা কেবল এস্‌রাজের কথা বলিলাম। হারমোনিয়ম্, বেহালা, সারঙ্গী, বাঁশী প্রভৃতি সকল বাদ্যযন্ত্রেই ঠিক্ এই রকমেই নানা মিহি সুরের মেলা-মেশা চলে, এবং সুরের মোলায়েম ভাব এবং মিঠে-কড়া আওয়াজ ইহারি উপরে নির্ভর করে। গ্রামোফোনের সুর নাকি অর্থাৎ অনুনাসিক; সারঙ্গীর সুর নাকি এবং নারী-কণ্ঠের মতো; কোনো গায়কের গলার সুর ঝাঁজালো,

আবার কাহারো কাহারো সুরে যেন জমকালো ভাব একটুও থাকে না। আবার দেখ, ব্যাগ-পাইপ্ ও সাপুড়েদের তুবড়ির আওয়াজ যেমন জমকালো তেমনি শুনিতে ভালো; কিন্তু পিতলের বাঁশির আওয়াজ মোটেই সে-রকমটি নয়। ইহার কারণ খাঁটি সুরের সঙ্গে নানা রকম মিহি সুরের মিলন ছাড়া আর কিছুই নয়।

শব্দে শব্দে নিঃশব্দ

আলোয় আলোয় আঁধার, শব্দে শব্দে নিঃশব্দ, ভাবে ভাবে অভাব। এই কথাগুলি শুনিলে চমকাইয়া উঠিতে হয়। কিন্তু বিজ্ঞানে এ সব কথা সত্য। এমন সত্য যে চোখে আঙুল দিয়া দেখানো যায়। দুটা আলোতে মিলিয়া যে অন্ধকার হয়, তোমাদিগকে সে-সম্বন্ধে এখন কোনো কথা বলিব না। শব্দে শব্দে যে নিঃশব্দ হয়, তাহারই আলোচনা করিব।

একটা উদাহরণ লওয়া যাউক। মনে কর, পুষ্করিণীর স্থির জলের কোনো জায়গায় একটা ঢিল ফেলিলাম। এই অবস্থায় কি হয়, তাহা তোমাদিগকে অনেক বার বলিয়াছি। সেই জায়গাটিকে কেন্দ্র করিয়া ঢেউয়ের পরে ঢেউ কাতারে কাতারে কিনারার দিকে ছুটিতে থাকে। ঢেউগুলি যে কি-রকম তাহাও তোমরা জানো। জল একবার উঁচুতে উঠে এবং তার পরে নীচে নামে। জলের এই উঁচু-নীচু লইয়াই এক-একটা ঢেউ হয়।

আবার মনে কর, পুকুরের জলের দুই জায়গায় ঢিল ফেলিয়া যেন দুইটি ঢেউয়ের কেন্দ্র করা গেল। এখন দুই জায়গা হইতেই, চাকার মতো ঢেউয়ের পর ঢেউ ছুটিতে থাকিবে। দুই কেন্দ্রের ঢেউ কিছুক্ষণ পরস্পর তফাতে থাকিবে, কিন্তু

একটু পরেই কিন্তু একের ঢেউ অন্যের ঘাড়ে চাপিয়া একটা এলো-মেলো কাণ্ড বাধাইয়া দিবে। তোমরা পুকুরের দুই জায়গায় দুইটা ঢিল ফেলিয়া পরীক্ষা করিলে ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাইবে। মনে কর, কোনো এক জায়গায় যখন প্রথম ঢেউগুলির একটিতে জল উঁচু হইয়া উঠিল, তখন দ্বিতীয় ঢেউ-গুলির একটিতে ঠিক সেই জায়গার জলই নীচু হইল। অর্থাৎ প্রথম সারির ঢেউ যখন জলকে উঁচু করিতে চেষ্টা করিল, তখন দ্বিতীয় সারির একটা ঢেউ ছুটিয়া সেই জলকেই নীচু করিতে গেল। ইহার ফলে কি হইবে, তোমরা বলিতে পার না কি? উঁচুতে ও নীচুতে কাটাকাটি হওয়ায় দুই ঢেউয়ের মিলনের জায়গায় ঢেউয়ের কোনো চিহ্নই থাকিবে না। অর্থাৎ সেখানকার জল না-উঁচু না-নীচু হইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবে। একের ঢেউয়ের উঁচু অংশ অন্য ঢেউয়ের নীচু অংশের সহিত মিলিয়া গেলে সেখানকার জলটুকুর এই রকমে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকা ব্যতীত আর গতি নাই। এই যে কথাগুলি মুখে বলিলাম, তোমরা জলের দুই জায়গায় দুইটা ঢিল ফেলিয়া পরীক্ষা করিয়ো, দেখিবে ঢেউয়ের কাটাকাটিতে সত্যই এক-একটা জায়গার জল স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

এখন শব্দের ঢেউয়ের কথা আলোচনা করা যাউক। তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, জলের ঢেউ যেমন জলকে উঁচু-নীচু করিয়া ছুটিয়া চলে, সাধারণ শব্দের ঢেউ সে-রকমে চলে

না। তাহা বাতাসকে সংকুচিত ও প্রসারিত করিতে করিতে সেকেণ্ডে ১১০০ ফিট বেগে চলা-ফেরা করে। মনে কর, দুইটা বাদ্যযন্ত্র হইতে দুই রকম শব্দের ঢেউ বাহির হইয়া যেন এক সঙ্গে আমাদের কানে আসিতেছে। জলের ঢেউয়ের উঁচুতে ও নীচুতে মিলিয়া জল স্থির ছিল, এখানে সেই রকমে একটা শব্দের ঢেউয়ের সংকোচ আর একটা ঢেউয়ের প্রসারণের সহিত মিলিয়া যাওয়া কখনই অসম্ভব নয়। মনে করা যাউক যেন এক ঢেউয়ের সংকোচ আর এক ঢেউয়ের প্রসারণের সহিত মিলিয়া গেল। এখন ইহার ফল কি হইবে? এই দুইটি পরস্পরকে কাটাকুটি করিয়া বাতাসটুকুকে স্থির রাখিবে! অর্থাৎ এই প্রকার দুই ঢেউয়ের মিলনে সেখানকার বাতাসে ঢেউ থাকিবে না এবং কানে ধাক্কা দিবে না,—তখন দুই শব্দের ঢেউয়ে মিলিয়া নিঃশব্দের সৃষ্টি করিবে।

আর একটা উদাহরণ দিলে বোধ করি বিষয়টা পরিষ্কার হইবে। মনে কর, দুইটা বেহালার তারকে একই জোরে বাঁধিয়া আওয়াজ করা গেল। ধরা যাউক, দুই তারের প্রত্যেক হইতে যেন এক শতটা করিয়া শব্দের ঢেউ বাহির হইতেছে এবং কানে সেই ঢেউগুলির ধাক্কা পড়িতেছে। ইহার ফল কি হইবে? এক ঢেউয়ের সংকোচ ও প্রসারণ, অন্য ঢেউয়ের সংকোচ ও প্রসারণের সঙ্গে মিলিয়া যাইবে। কাজেই শব্দটা কানে জোরালো ঠেকিবে। এখন মনে করা যাউক যেন, যন্ত্র দুইটির তার একই টানে বাঁধা

নাই। তাই একটা হইতে যেন মিহি এবং অন্যটা হইতে একটু মোটা আওয়াজ বাহির হইতেছে। ধরা যাউক যেন, আলগা তার হইতে যে-সময়ে ত্রিশটা শব্দের ঢেউ কানে ঠেকিতেছে, অন্য তার হইতে সেই সময়ে সাড়ে-ত্রিশটা ঢেউ কানে লাগিতেছে। অর্থাৎ প্রথম যন্ত্রের শেষ ঢেউয়ের শেষ আধ-খানা যখন কানে ধাক্কা দিতেছে, ঠিক তখনি দ্বিতীয় যন্ত্রের শেষ ঢেউয়ের প্রথম আধখানা আসিয়া ধাক্কা দিল। একটা সংকোচ এবং একটা প্রসারণ লইয়াই এক-একটি ঢেউয়ের সৃষ্টি। সুতরাং বলিতে হয়, যখন প্রথম যন্ত্রের ঢেউয়ের প্রসারণ আসিয়া কানে ধাক্কা দিল, ঠিক তখনি দ্বিতীয় যন্ত্রের কেবল সংকোচই কানে লাগিল। ইহার ফল কি হইল? সংকোচ ও প্রসারণে কাটাকাটি হইল। কাজেই ক্ষণেকের জন্য ঢেউ থাকিল না এবং শব্দও শুনা গেল না।

আর একটা উদাহরণ লও। একটা তানপুরা হইতে যেন সেকেণ্ডে ২৫৬-টা ঢেউ বাহির হইতেছে। এই ঢেউগুলি নিয়মিত কানে ঠেকিলে আমরা চলিত "সা" সুর শুনিতে পাই। কাজেই আমরা তানপুরার আওয়াজে "সা" সুর শুনিতেছি। আর একটা তানপুরা হইতে যেন ২৫৮-টা ঢেউ কানে ধাক্কা দিতেছে। ইহা "সা" নয়, এবং "রে" নয়, সা অপেক্ষা মিহি এবং "রে" অপেক্ষা মোটা। এই দুই ঢেউ এক সঙ্গে কানে আসিতে থাকিলে কি হইবে দেখা যাউক। সিকি সেকেণ্ডে প্রথম যন্ত্র হইতে ৬৪-টা এবং দ্বিতীয় যন্ত্র হইতে ৬৪৷৹-টা ঢেউ

কানে লাগিবে। কাজেই দেখ, দুইয়ের মধ্যে আধখানা ঢেউয়ের তফাৎ হইল। ইহার ফলে একের প্রসারণের এবং অপরের সংকোচের কাটাকুটি হইয়া গেল। ইহাতে অতি অল্প সময়ের জন্য ঢেউ রহিল না, কাজেই শব্দও শোনা গেল না। আধ্ সেকেণ্ডের পরে কি হইবে, এখন ভাবিয়া দেখ। সেই সময়ে প্রথম তানপুরা হাতে ১২৮-টা এবং দ্বিতীয়টি হইতে ১২৯-টা ঢেউ কানে আসিয়া ঠেকিবে। একটা পূর্ণ ঢেউয়ের তফাৎ। দুই যন্ত্রের ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য সমান নয়। তবুও এখন একের সঙ্কোচে ও প্রসারণে অপরের সঙ্কোচের এবং প্রসারণের কতকটা মিল হইবে। কাজেই শব্দটা প্রবল হইবে। তার পরে ¾ সেকেণ্ডের শেষে দুই ঢেউয়ের অবস্থা কি হইবে এই রকমে হিসাব করিলে দেখিবে, তখন প্রথম যন্ত্র হইতে ১৯২-টি ঢেউ এবং দ্বিতীয় হইতে ১৯৩॥০-টি কানে আসিয়া ধাক্কা দিবে। এখানে আবার ঢেউয়ে ঢেউয়ে কাটাকাটি এবং আবার শব্দে শব্দে নিঃশব্দ।

তাহা হইলে দেখা গেল, দুইটা সুরের মধ্যে যখন একটা হইতে সেকেণ্ডে ২৫৬ এবং অন্যটি হইতে ২৫৮ ঢেউ বাহির হয়, তখন এক সেকেণ্ডে দুইটা ঢেউয়ের সম্পূর্ণ কাটাকাটি হয়। অর্থাৎ ঢেউয়ের সংখ্যার অন্তর অর্থাৎ বিয়োগ-ফল যাহা হয়, ততটা ঢেউ আমাদের কানে একেবারেই ধাক্কা দেয় না এবং অন্য ঢেউগুলিও আংশিক কাটাকাটির জন্য পূর্ণমাত্রায় কানে ধাক্কা দিতে পারে না।

তোমরা দু'খানা বেহালার একটাতে মিহি এবং অন্যটাতে একটু মোটা সুর বাহির করিয়া পরীক্ষা করিয়ো, দেখিবে সকল সময়ে দুই সুরের মিল হইতেছে না, এবং সুর দুইটি যেন ঢেউয়ের মতো উঠা-নামা করিতেছে। তারের কাঁপুনি থামে নাই, অথচ সুরের এই রকম ঢেউ-খেলানো ভাব কেন হয়? এক সুরের ঢেউয়ের সঙ্গে অন্য সুরের ঢেউয়ের কাটাকাটিতেই ইহা ঘটে। তোমরা ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়ো। এই পরীক্ষা কঠিন নয়।

আমাদের বাগ্‌যন্ত্র

তোমরা ও আমরা সকলে কথা কহিতে পারি এবং গলা হইতে সরু-মোটা নানা রকম সুরও বাহির করিতে পারি। কেহ কেহ আবার গানও করিতে পারে। তখন গলা হইতে নানা প্রকার সুস্বর বাহির হয়। তাহা হারমোনিয়ম্ ও এস্‌রাজের শব্দের মতোই সুমিষ্ট। হারমোনিয়ম্ বাঁশী ও এস্‌রাজ প্রভৃতি হইতে কি-রকমে সুর বাহির হয়, তাহা তোমরা শুনিয়াছ। তোমার-আমার গলা হইতে কি-রকমে শব্দ বাহির হয়, এখন তাহাই বলিব।
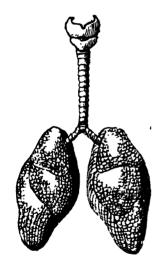
আমাদের গলার ভিতরকার যে-অংশ হইতে শব্দ বাহির হয়, তাহাকে সাধারণ বাদ্যযন্ত্রের মতো এক প্রকার যন্ত্র বলা যায়। এখানে আমাদের বাগ্‌যন্ত্রের ছবি দিলাম। ইহাকে এড়োএড়ি ভাবে চিরিলে যে-রকম দেখায় পর-পৃষ্ঠার ছবিটি ঠিক্ সেই রকমে আঁকা আছে। আমাদের কণ্ঠনালীর উপরকার

প্রান্তে এই যন্ত্রটি এবং ভিতরকার প্রান্তে ফুস্‌ফুস্ লাগানো থাকে। ছবির মাঝে যে সরু খাঁজ দেখা যাইতেছে, উহাই বাতাসের পথ। আমরা যখন কথা বলিতে চাই বা গান করিতে যাই, তখন ফুস্‌ফুসের বাতাসকে ঐ সরু খাঁজের ভিতর দিয়া চালাইতে থাকি। খাঁজের পাশগুলি খুব মোটা নয়। রীডের কথা তোমাদের মনে আছে ত? হার্‌মোনিয়াম্ ও ক্লারিওনেটের রীড্ কাঁপিলে শব্দের ঢেউ উৎপন্ন হয়। বাগ্‌যন্ত্রের খাঁজের পাশ গুলিরীডের মতোই পাত্‌লা। তাই সেই ছিদ্রপথ দিয়া যখন জোরে ফুস্‌ফুসের বাতাস বাহির হইতে থাকে, তখন ঐ ছিদ্র-পথের পাশগুলি কাঁপিতে আরম্ভ করে। ইহাতেই শব্দের ঢেউ হয়। তার পরে সেই ঢেউ যখন কানে আসিয়া ধাক্কা দেয়, তখন আমরা গলার আওয়াজ শুনিতে পাই।

কাহারো গলার আওয়াজ মোটা, কাহারো মিহি। মেয়েদের এবং ছোটো ছেলেদের গলার স্বর মিহি, কিন্তু পুরুষের গলা মোটা। ইহা কেন হয়? পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, পুরুষদের বাগ্‌যন্ত্রে বাতাসের পথ যত লম্বা থাকে, মেয়েদের ও ছোটো ছেলেদের তত লম্বা থাকে না। লম্বা তার ধীরে কাঁপে এবং খাটো তার তাড়াতাড়ি কাঁপে, ইহা তোমরা আগেই শুনিয়াছ। এখানে তাহাই ঘটে। মেয়ে ও ছোটো ছেলেদের

গলার খটো ছিদ্রপথের পাশগুলি যত তাড়াতাড়ি কাঁপে, পুরুষদের তত তাড়াতাড়ি কাঁপে না। এই জন্মই মেয়েদের তুলনায় পুরুষদের গলার স্বর মোটা।

পুরুষের গলা হইতে যে-সকল সুর বাহির হয়, তাহার ঢেউয়ের সংখ্যা সেকেণ্ডে ১৯০ হইতে ৬৭৮ পর্য্যন্ত হয়। কিন্তু মেয়েদের গলার কম্পন-সংখ্যা কখনই ৫৭২ এর নীচে নামে না এবং যাহাদের গলার স্বর খুব মিহি তাহাদের গলা সেকেণ্ডে ১৬০৬ বার পর্য্যন্তও কাঁপিতে দেখা যায়।

গান গাহিবার সময়ে ওস্তাদি গলা হইতে যে কত রকমের মিহি ও মোটা স্বর বাহির হয় তাহা তোমরা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ। গায়কেরা কি রকম গলা হইতে ইচ্ছামত মিহি ও মোটা সুর বাহির করেন, তাহাও জানা গিয়াছে। বাগ্‌যন্ত্রের চারিপাশে যে সাদা অংশটি দেখিতেছ, উহা মাংসপেশী। গায়কেরা এই মাংসপেশীকে সংকুচিত ও প্রসারিত করিয়া বায়ুপথের খাঁজকে ইচ্ছামত ছোটো-বড় করিতে পারেন। ইহাতেই মিহি-মোটা সুর বাহির হয়।

তোমরা আগেই শুনিয়াছ, সেতার বা অন্য বীণা-যন্ত্রের তার কাঁপিয়া যে শব্দের ঢেউ উৎপন্ন করে, তাহা প্রথমে অতি মৃদু থাকে। সেই ঢেউ যখন সেতার প্রভৃতির শব্দ-ভাণ্ড, অর্থাৎ তুম্বী প্রভৃতির ভিতরকার বাতাসকে কাঁপায়, তখন ঢেউ প্রবল হইয়া পড়ে। আমাদের গলার সুরেও তাহাই দেখা যায়। বুকের ভিতরকার ফুস্‌ফুসের বাতাস কণ্ঠনালী

দিয়া জোরে বাহির হইবার সময় যে-কাঁপুনি সৃষ্টি করে, তাহাতে জোরালো শব্দ হয় না। এই কাঁপুনি যখন আমাদের মুখের গহ্বরের বাতাসকে কাঁপাইতে থাকে, তখন সেই বাতাসের কাঁপুনিতেই শব্দ প্রবল হয়। মুখের কোটরকে আমরা জিভের সাহায্যে কখনো তুবড়াইয়া এবং কখনো ফুলাইয়া ছোটো-বড় করিতে পারি। মুখ-কোটরের এই নানা প্রকার আয়তন, নানা প্রকার সুরকে প্রবল করে।

যাত্রার জুরীরা বা কালোয়াতেরা গানের একটা কথা লইয়া প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া সুরের কায়দা দেখান। তোমরা যদি লক্ষ্য কর, তবে দেখিবে,এই সুরভাঁজার কাজ "অ আ ই উ"এই রকম এক-একটা স্বরবর্ণকে লইয়াই চলে। ক খ গ ঘ ইত্যাদি ব্যঞ্জন বর্ণকে লইয়া কায়দা দেখানো চলে না। সকল লোকের গলার আওয়াজ সমান নয়। কারো আওয়াজ কর্কশ, কাহরো মিষ্ট। মিষ্ট গলায় আদর করিয়া যখন কেহ তোমাদের ডাকিবেন, তখন লক্ষ্য করিলে দেখিবে, কথার শেষে "অ আ ই উ এ" প্রভৃতি স্বরবর্ণকে লইয়া মিষ্ট সুর বাহির হইতেছে। যাহা হউক, স্বরবর্ণের মিষ্ট সুরগুলিকে যে আমরা মুখের কোটরকে ছোটো বড় করিয়া বাহির করি, একটু পরীক্ষা করিলেই তোমরা তাহা বুঝিতে পারিবে।

মনে কর, যাত্রার জুরী গলা হইতে "আ" শব্দটা বাহির করিয়া হাত নাড়িয়া তান দিতেছেন। তাঁহার মুখ লক্ষ্য করিয়ো, দেখিবে মুখের আকৃতি হইয়াছে যেন তেল-ঢালা ফনেলের

মতো। তার পরে তিনি যখন "ও" শব্দটা উচ্চারণ করিয়া সুর ভাঁজিবেন, দেখিবে মুখের আর সে চেহারা নাই। তখন মুখ-খানি হইয়া দাঁড়াইবে যেন বড় গলা-ওয়ালা বোতলের মতো। "উ"-এর উপরে টান দিয়াও অনেকে গান করেন। মুখখানাকে সরু-গলা বোতলের মতো না করিলে "উ" উচ্চারণ করা যায় না।

ফোনোগ্রাফ্

ফোনোগ্রাফ্ বা গ্রামোফোন্ যন্ত্র হয় ত তোমরা সকলেই দেখিয়াছ এবং অনেকে হয় ত তাহার গানও শুনিয়াছ। গায়ক যে-রকম সুরে এবং যে-রকম ওস্তাদি দেখাইয়া গান করেন, গানের কল হইতে প্রায় সেই-রকম গান আপনিই বাহির হয়। কেবল গান নয়, কোনো কথা বলিলে বা কোনো যন্ত্র বাজাইলে যে-শব্দ হয়, তাহাও ফোনোগ্রাফে ধরিয়া রাখা যায় এবং ইচ্ছামত সেই সকল কথা বা বাজনা যখন-তখন কল হইতে বাহির করিয়া শুনা যায়।

গানের কল হইতে এই রকমে গান্ বাহির হইতে দেখিলে, বড় আশ্চর্য্য লাগে। কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার বিশেষ কিছু নাই। শব্দ-সম্বন্ধে যে-সকল বিষয় শিখিয়াছ, তাহা হইতেই গানের কলের কৌশল তোমরা সহজে বুঝিতে পারিবে।

যখন কোনো জিনিষ হইতে শব্দ বাহির হয়, তখন তাহা কাঁপে এবং সেই কাঁপুনিতে বাতাস কাঁপিয়া যে-শব্দের ঢেউ উৎপন্ন করে, তাহা কানে আসিয়া ঠেকে। ইহাতেই আমরা শব্দ শুনিতে পাই। এই কথা তোমাদিগকে আগে বার বার বলিয়াছি। আমরা যখন গান করি বা কথা বলি, তখনো ইহার অন্যথা হয় না। তখন আমাদের গলার ভিতর-

কার বাগ্‌যন্ত্র কাঁপে এবং সেই কাঁপুনিতে বাতাসে ঢেউ উৎপন্ন হইয়া কানে আসিয়া ধাক্কা দেয়। ইহাতে আমরা গান বা কথাবার্ত্তা শুনিতে পাই। সুতরাং বলিতে হয়, গলার কাঁপুনিতে যে-রকম শব্দের ঢেউ উৎপন্ন হয়, আমরা যদি অন্য কোনো জিনিষকে কাঁপাইয়া অবিকল সেই রকম ঢেউ উৎপন্ন করিতে পারি, তাহা হইলে সেই জিনিষ হইতে গলার স্বর শুনা যাইবে। ফোনোগ্রাফ-যন্ত্রে পাত্‌লা কাচ বা অন্য কোনো জিনিষের পর্‌দাকে বাগ্‌যন্ত্রের মতো কাঁপাইয়া ঐ প্রকারে হুবহু গলার স্বর বাহির করা হয়।

মনে কর, তুমি যখন গান করিতেছ বা কথা বলিতেছ, তখন তোমার মুখের খুব কাছে যেন একখানি পাতলা কাগজ বেশ টান করিয়া ধরা হইয়াছে। ইহাতে কাগজখানির অবস্থা কি হইবে, তাহা বলা কঠিন নয়। তুমি গানের সময়ে গলা কাঁপাইয়া বাতাসে যে শব্দের ঢেউ উৎপন্ন করিলে, তাহা কাগজে ধাক্কা দিবে। ইহাতে কাগজখানি স্থির হইয়া থাকিতে পারিবে কি? কখনই পারিবে না। শব্দের ঢেউয়ের ধাক্কা খাইয়া তাহা আগু-পিছু কাঁপিতে থাকিবে।

এখন মনে কর, গান বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সম্মুখে গান করায় কাগজখানি যে-রকমে কাঁপিয়াছিল, আমরা যেন কোনো গতিকে সেটিকে অবিকল সেই রকমেই কাঁপাইতে লাগিলাম। ইহাতে কি হইবে, তোমরা বলিতে পার কি? গান গাহিবার সময়ে তোমার বাগ্‌যন্ত্র যে-রকমে কাঁপিয়াছিল, কাগজখানি

অবিকল সেই রকমে কাঁপিতেছে। কাজেই কাগজের কাঁপুনিতে বাতাসে যে-শব্দের ঢেউ উৎপন্ন করিল, তাহাতে গানেরই শব্দ শুনা যাইবে। ফোনোগ্রাফের কলে এই রকমেই গানের শব্দ বাহির হয়।

এখানে ফোনোগ্রাফের একটা ছবি দিলাম। ছবিতে ঢাকের মতো যে অংশটা দেখিতেছ, তাহাতে মোম বা অন্য কোনো রকম জিনিষের প্রলেপ আছে। ছবির ডাইন দিকে যে হাতল রহিয়াছে, তাহার গোড়ার স্ক্রুপের প্যাঁচ্ কাটা আছে। তাই হাতল ঘুরাইলে ঢাককে বামে বা
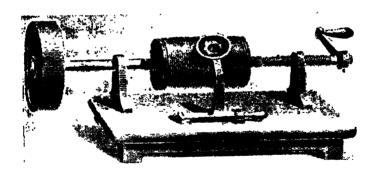
দক্ষিণে সরানো যায়। যন্ত্রের উপরে যে কৌটার মতো অংশ দেখিতেছ, তাহার ভিতরে এক খণ্ড খুব পাতলা কাচ বা চামড়া লাগানো আছে। তাহারি গায়ে আবার একটা ছুচ্ লাগানো থাকে।

মনে কর, তুমি যেন কৌটার কাছে মুখ রাখিয়া গান গাহিতে আরম্ভ করিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রের হাতলটি ঘুরাইতে থাকিলে। এই অবস্থায় কি হইবে ভাবিয়া দেখ। তোমার গলার আওয়াজে কৌটার ভিতরকার সেই পাত্‌লা চামড়ার পর্দাটি কাঁপিতে থাকিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার পিছনের ছুঁচটি কাঁপিয়া সেই ঢাকের গায়ে কতকগুলি গর্ত্ত আঁকিয়া দিবে। ঢাক স্ক্রুপের প্যাঁচে ঘুরিতেছে। কাজেই ছুঁচের ঠোকরে যে-গর্ত্ত হইল তাহা একটার উপরে অন্যটা পড়িল না। অর্থাৎ গর্ত্তগুলি ঢাকের গায়ে স্ক্রুপের প্যাঁচের মতো স্পষ্টভাবে আঁকা থাকিল। এই রকম গর্ত্ত-কাটা ঢাককে বলা হয়, ফোনোগ্রাফের রেকর্ড অর্থাৎ শব্দ-লিপি।

এই রেকর্ড বা শব্দ-লিপি দিয়া যে রকমে শব্দ বা গান বাহির করা যায়, তোমরা তাহা এখন সহজেই বুঝিতে পারিবে। মনে কর, গান বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আমরা যন্ত্রের পিছনকার কৌটার সেই ছুঁচটিকে রেকর্ডের গর্ত্তে লাগাইয়া ঢাকটিকে উল্টা পাকে ঘুরাইতে লাগিলাম। ইহাতে ছুঁচের অবস্থা কি হইবে অনায়াসে বলা যায়। অসমান রাস্তায় গাড়ি চালাইলে যেমন তাহা উঁচু-নীচু হইয়া ঝাঁকানি দিতে থাকে, ছুঁচটি একবার রেকর্ডের গর্ত্তে পড়িয়া এবং পর-ক্ষণেই উপরে উঠিয়া যেন সেই রকমে কাঁপিতে থাকিবে। কিন্তু ছুঁচ সেই পাত্‌লা চামড়ার গায়ে আঁটা আছে। সুতরাং গর্ত্তে উঠানামা করিয়া তাহা যেমন কাঁপিতে থাকিবে, সঙ্গে সঙ্গে চামড়াটাও কাঁপিতে থাকিবে।

কিন্তু ইহাতে চামড়ার কাঁপুনি কি-রকম হইবে, তোমরা বলিতে পার না কি? চামড়া কাঁপিয়া আগে যে-সকল গর্ত্ত করিয়া রাখিয়াছে, এখন সেই সকল গর্ত্তে পড়িয়াই তাহা কাঁপিতেছে। সুতরাং চামড়া গলার আওয়াজের ধাক্কায় যেমন কাঁপিয়াছিল, এখনকার
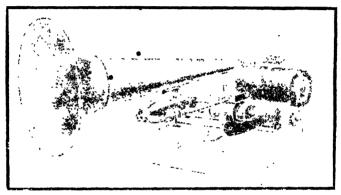
কাঁপুনিও অবিকল সেই রকমই হইবে, তাহা বোধ করি তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ। চামড়ার কাঁপুনিতে বাতাস ঠিক্ আগেকার মতোই কাঁপিতেছে। কাজেই ইহাতে যে-শব্দের ঢেউ উঠিবে, তাহাতে আমরা আগেকার গানই শুনিতে পাইব। ইহাই ফোনোগ্রাফ্ হইতে গান বা অপর শব্দ বাহির করার কৌশল।

ফোনোগ্রাফের আর একখানি ছবি এখানে দিলাম। ইহাতে তোমরা যন্ত্রের সম্পূর্ণ চেহারা দেখিতে পাইবে। দেখ, যন্ত্রের কৌটার মুখে একটা শানাইয়ের মতো নল লাগানো আছে। কৌটার ভিতরকার চামড়ার কাঁপুনি এই নলের ভিতরকার বাতাসকে জোরে কাঁপায়। তাই চামড়ার মৃদু কাঁপুনিতে শব্দের

প্রবল ঢেউ হয়। এইজন্যই কোনো ঘরে ফোনোগ্রাফ্ বাজাইলে ঘরের সকল লোকেই শব্দ শুনিতে পায়।

তোমরা আজকাল যে গ্রামোফোন্ দেখিতে পাও, তাহা ঠিক্ ফোনোগ্রাফের মতোই যন্ত্র। ফোনোগ্রাফের শব্দ-লিপি ঢাকের উপরে অঙ্কিত হয় এবং গ্রামোফোনে তাহা চাক্তির উপরে আঁকা থাকে। ইহাই দুই যন্ত্রের একমাত্র তফাৎ। হাতে হাতল ঘুরাইয়া আজকাল আর এই সকল যন্ত্র চালানো হয় না। যন্ত্রে ঘড়ির স্প্রিঙের মতো স্প্রিং থাকে। তাহাতে দম দেওয়া হয় এবং দমের জোরে শব্দ-লিপির চাক্তি বা ঢাক নিয়মিতভাবে ঘুরে।

ফোনোগ্রাফ্ যন্ত্র কে প্রথমে নির্ম্মাণ করেন, তাহা হয় ত তোমরা সকলে জানো না। আমেরিকার টমাস্ এডিসন্ নামক একজন বৈজ্ঞানিকের মনে এই যন্ত্রের কথা প্রথমে উদিত হইয়াছিল। এডিসন্ কেবল বৈজ্ঞানিক নহেন, তিনি নিজের হাতে নূতন নূতন যন্ত্রও নির্ম্মাণ করিতে পারেন। এজন্য তাঁহাকে মিস্ত্রি ডাকিয়া যন্ত্র তৈয়ারি করাইতে হয় নাই। তিনি নিজের হাতে যে-রকম যন্ত্র তৈয়ারি করিয়াছিলেন ফোনোগ্রামের প্রথম ছবিটি কতকটা সেই রকমে আঁকা হইয়াছে। এই যন্ত্রের শব্দ খুব প্রবল ও স্পষ্ট হইত না। ক্রমে নানা পরিবর্ত্তনের পরে, তাহাই এখন একটি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর যন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সমাপ্ত